দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ঈসায়ী

শরীয়াতের আহকাম আর্কাইভ- ২০১৬

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ঈসায়ী

সূচিপত্র

আমাদের ঈমানের অবস্থা কেমন? কিভাবে বুঝবো? ৫

দারুল হারবের পরিচয়ঃ বাংলাদেশ কি দারুল হারব? ৭

ঈমানী আকায়েদ ও শরিয়তের স্পষ্টভাবে ঘোষিত বিষয়ের বিকৃতি ও অপব্যখ্যা অস্বীকারেরই এক প্রকার ১৯

"গুপ্ত হত্যার ইসলামি বিধান"- শায়খ ফারিস আল জাহরানি...২৫

কাফিরদের রক্ত হালাল হওয়ার দলিল-Murabit ভাই.....৪৮

শেখ হাসিনা প্রশ্ন করেছেনঃ মানুষের তৈরি আইন মানতে সমস্যা কোথায়? ৫৩

কুফর দুনা কুফর.....৫৯

মুরতাদ হত্যা কি হুদূদের অন্তর্ভুক্ত?!!!.....৬৫

#মুরতাদথহত্যাথদ্বিতীয়থপর্ব : ইমামের অনুমতি, ইস্তেতাব ও তিনদিন অবকাশের বিধান.....৬৯

কেন আমেরিকা ও এর মিত্ররাস্ট্রের সকল কাফের নাগরিক হত্যাযোগ্য ? জ্ঞানপাপীদের প্রত্যুত্তরসহ...!.....৭৪

লুতফুর রহমান ফরাজি ও "আহলে হক কর্তৃক সৃষ্ট সংশয়ের জবাব-১ প্রশ্ন - দারুল হরব কাকে বলে? বাংলাদেশ কি দারুল হারব?.....৮২

লুতফুর রহমান ও "আহলে হক কর্তৃক সৃষ্ট সংশয়ের জবাব- জিহাদ কি ভূখণ্ড দারুল আমান হওয়া বা না হওয়ার উপর নির্ভরশীল ?.....৯৫

লুতফুর রহমান ফরাজি ও "আহলে হক কর্তৃক সৃষ্ট সংশয়ের জবাব-৪ - দারুল মুয়াদায়াহ ও দারুল আহাদ / দারুল আমান ১০৬

জামাতের গুরুত্ব.....১১২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পড়ার লাভ ও উপকারিতা ১২৫

ফতওয়াথ২=- আমার ছেলের নাম রাখবো বলে ঠিক করেছি, এ ব্যাপারে ইসলাম কি কোন নির্দেশনা দিয়েছে?.....১৪১

লুতফুর রহমান ফরাজি ও "আহলে হক কর্তৃক সৃষ্ট সংশয়ের জবাব-১ কখন দারুল হারব দারুল ইসলামের পরিণত হয়?...১৪৬

আমাদের ঈমানের অবস্থা কেমন? কিভাবে বুঝবো?

Taalibul ilm

Super Moderator

০১-২০-২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আমাদের ঈমানের অবস্থা বুঝার জন্য দেখতে হবে আমরা নীচের বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে মুক্ত কিনা?

১) পাপে নিমজ্জিত হওয়া এবং হারাম কাজ করা।

২) অন্তকরণে কাঠিন্য অনুভব করা (আল্লাহর ভয়ে কান্না না আসা, আল্লাহর আয়াত স্মরণ হলে মন কোমল না হওয়া)।

৩) ভালোভাবে ইবাদাত না করা (তাড়াহুড়া করা, ইহসানের অভাব)।

৪) আনুগত্য ও ইবাদাতে শৈথিল্যতা ও অলসতা প্রদর্শন করা।

৫) মেজাজের ভারসাম্যহীনতা এবং বক্ষের অপ্রশস্ততা (উগ্র মেজাজ)।

৬) কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া ।

৭) আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর প্রার্থনার ব্যাপারে গাফেল থাকা ।

৮) কোনো হারাম কাজ সংঘটিত হতে দেখলেও ক্রোধের সঞ্চার না হওয়া।

৯) নিজেকে প্রকাশ করতে ভালোবাসা।

১০) কৃপণতা।

১১) কথা ও কাজে গরমিল।

১২) মুসলমান ভাইয়ের বিপদ দেখলে খুশি হওয়া।

১৩) শুধুমাত্র কাজটি অপছন্দনীয় কিনা দেখা (অর্থাৎ এটা মাকরুহ / হারাম না হলে ঐ কাজ করে ফেলা, কাজটি উত্তম কিনা সেদিকে লক্ষ্য না দেয়া)।

১৪) ভালো কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করা, নেকীর কাজকে গুরুত্ব না দেয়া।

১৫) মুসলমানদের সমস্যার ব্যাপারে গুরুত্ব না দেয়া।

১৬) ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন করা।

১৭) দ্বীনের কাজে দায়িত্বানুভূতি না থাকা।

১৮) বিপদাপদে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া ।

১৯) অনর্থক ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্ক করা।

২০) দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও এর প্রতি ঝুঁকে পড়া।

২১) জনশ্রুতিকে বর্ণনার জন্য গ্রহণ করা।

২২) নিজেকে নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকা।

সূত্রঃ ঈমানী দূর্বলতা, শাইখ সালিহ আল মুনাজ্জিদ।

যদি আমরা উপরের বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে মুক্ত থাকি, তাহলে আলহামদুলিল্লাহ। তা না হলে বড় বিপদ!!

এই পোষ্টদাতা পোষ্টের উদ্দিষ্টদের মধ্যেই একজন, এর বাইরে নয়। এই পোষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্য আমার নিজের ইসলাহতে সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়া। সকল ভাই / বোনদেরকে অনুরোধ খাসভাবে আমার জন্য দুয়া করবেন, যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার সকল ঈমানী দূর্বলতা দূর করে দেন, আমাকে শহীদদের মধ্যে সামিল হবার সৌভাগ্য দান করেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে ও আমাদের সকলকে উপরের দূর্বলতাগুলো থেকে মুক্ত থাকার তাউফিক দান করুন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৭৯৫

দারুল হারবের পরিচয়ঃ বাংলাদেশ কি দারুল হারব?

'দারুল হরব' এর পরিচয়

Abu Khubaib

Senior Member

০৪-২৯-২০১৬

১। **الموسوعة الفقهية الكويتية** তে বলা হয়েছে:

دار الحرب هي كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة

দারুল হরব এমন ভুমি যেখানে কুফুরী শাযন বিজয়ী থাকে।

২। ফাতওয়ায়ে মাহমূদিয়াতে বলা হয়েছে: খ:২০ পৃ:৩৬৬

دار الحرب وہ ہے کہ جو مقام ایسا ہو کہ وہاں اہل شرك کے احکام جاري ہو اور اسکی آس پاس متصل مقامات کا حال بھي ایسا ہي ہو اور وہاں کوئي مسلمان اپنے اسلام کي بنا پر مأمون نہ ہو وہ دار الحرب ہے۔

দারুল হরব এমন রাষ্ট্রকে বলে যেখানে কাফেরদের বিধান কার্যকর থাকে এবং তার আশপাশের অঞ্চলগুলোও এমনই এবং সেখানে কোন মুসলমান ইসলামের বলে বলীয়ান ও নিরাপদ নয়।

৩। **جامع الرموز** গ্রন্থে বলা হয়েছে:

دار الإسلام ما يجري فيه حكم إمام المسلمين وكانوا فيه آمنين ودار الحرب ما خافوا فيه من الكافرين.

দারুল ইসলাম সে রাষ্ট্রকে বলে যেখানে মুসলমানদের মুসলিম শাসকের হুকুম বলবৎ থাকে এবং মুসলমানগণ সেখানে নিরাপদ।

আর দারুল হরব সে রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানগণ কাফেরদের কারণে জান মালের ক্ষতির আশংকা করে।

দারুল হরবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানের পর এখানে আমরা ফকীহুন নফস রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর ফতোয়ার কিছু আলোচনা পেশ করতে পারি। হযরত বলেন, " শোন! কোন শহর বা রাষ্ট্র দারুল হরব বা দারুল ইসলাম হবার ভিত্তি হল ক্ষমতা ও শক্তির উপর। ক্ষমতা ও শক্তি কাফেরদের হাতে না মুসলমানদের হাতে। বাস এতটুকুই। তাই যে সকল স্থান মুসলমানদের বিধি বিধানের অধীন তা দারুল ইসলাম আর যা কাফেরদের বিধি বিধানের অধীন তা দারুর হরব। পূর্বোক্ত সংজ্ঞা সমূহ থেকেও এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে।"

তাই তো কারীউল হিদায়া -ইবনুল হুমামের উস্তাদ প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ- কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সমুদ্রের ব্যাপারে। জবাবে তিনি বলেছিলেন, (যেহেতু সেখানে মুসলিম বা কাফের কারো কর্তৃত্ব নেই) তাই তা দারুল ইসলাম ও হবে না আবার দারুল হরব ও হবে না।

যখন এ মাসআলার ভিত্তিই হলো ক্ষমতা ও শক্তি তাই কোন অঞ্চলে শুধু মুসলমানদের বসবাসের কারণে কিংবা কাফরদের অনুমতি নিয়ে কিছু শা'আইরে ইসলাম পালনের কারণে (যেমন জুমা, ঈদ, মসজিদ, মাদরাসা, খানকা, তাবলীগ জামাতের কার্যাদী দ্বীনী মাহফিল সমূহ ইত্যাদি) তা দারুল ইসলাম হবে না। অনুরূপ কোন ভূখন্ডের উপর যদি মুসলমানদের ক্ষমতা থাকে তাহলে সেটা দারুল ইসলাম। যদিও তার অধিকাংশ অধিবাসীই কাফের হয় এবং মুসলিম শাসকের অনুমতিতে তাদের ধর্মীয় কার্যক্রম খোলাখুলিভাবে পালন করে।

বিষয়টি বাস্তব উদাহরন দিয়ে বুঝুন।

১. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম হিজরীতে ওমরাতুল কাযার জন্য এক বিশাল জামাত নিয়ে কাফেরদের অনুমতিতে মক্কায় প্রবেশ করেন। তিন দিন সেখানে অবস্থান করেন। এই তিন দিনে প্রকাশে ওমরা পালন, জামাতে নামায আদায় ও অন্যান্য ইবাদত সবই পালন করেছেন। কিন্তু মুসলমানদের এই বিশাল সংখ্যা ও প্রকাশ্য ইবাদতের কারণে এ তিন দিন মক্কা দারুল ইসলাম হয়ে যায়নি। বরং আগে যেমন দারুল হরব ছিল ঐ সময়ও দারুল হরবই থেকেছে।

২. মদীনায় রাষ্ট্র গঠণের পর প্রথম কয়েক বছর সেখানে ইহুদীদের তিন তিনটি গোত্র ছিল। তাদের এলাকা সমূহে তারা আপন ধর্ম পালন করত। তাদের সংখ্যাও কম ছিল না। কিন্তু ক্ষমতার বাগডোর যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এর হাতে ছিল তাই ইহুদীদের এলাকাগুলোও দারুল ইসলাম ছিল। কেউ তাকে দারুল হরব বলেনি।

باقيات فتاوى رشيديه ص৪৯৮-৪৯৭ :

এটাতো হল প্রথম থেকেই কোন্ অঞ্চল দারুল ইসলাম আর কোনটা দারুল হরব তা চিহ্নিত করার উপায়। এবার আসুন জেনে নেই, যে অঞ্চল দারুল ইসলাম ছিল তা কখন দারুল হরবে পরিণত হয়।

ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া/আলমগীরীর খ:২ পৃ:২৪৮ (দারুল ফিকর বৈরুত) এতে বলা হয়েছে:

قال محمد رحمه الله في الزيادات : إنما تصير دار الإسلام دار الحرب عند أبي حنيفة رح بشروط ثلاثة: أحدها: إجراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهار، وأن لا يحكم فيها بأحكام الإسلام . الثاني: أن تكون متصلة بدار الحرب ، لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام . الثالث: أن لا يبقى فيها مؤمن ولا ذمي آمنا بأمانه الأول الذي كان ثابتا قبل استيلاء الكفار ، للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة . ..... وقال أبو يوسف ومحمد رح بشرط واحد لا غير، وهو إظهار أحكام الكفر.

ইমাম মুহাম্মদ রঃ তার 'যিয়াদাত' কিতাবে বলেন, আবূ হানীফা রঃ এর মতে দারুল ইসলাম তিন শর্তে দারুল হরব হয়।

১. খোলাখুলিভাবে কাফেরদের আহকাম বাস্তবায়ন।

২. দারুল হরবের সাথে মিলে থাকা তথা উক্ত অঞ্চল ও দারুল হরবের মাঝে কোন দারুল ইসলাম না থাকা।

৩. এখানে বসবাসরত মু'মিন ও যিম্মীদের পূর্বে অর্জিত আমান উঠে যাওয়া যা তারা মুসলিম শাসক থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল।

আর সাহেবাইন ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান (রাহিমাহুমুল্লাহ) এর মতে শুধু এক শর্তই যথেষ্ট, তা হলো কুফুরী শাসন বাস্তবায়ন করা। জামিউর রুমূয গ্রন্থেও অনুরূপ কথাই বলা হয়েছে। আদ দুররুল মুখতারের

ইবারতও এমনই। এই উক্তিগুলো ফাতাওয়ায়ে আযীযী পৃ: ৫৮৩ ও ৪৫৪ তে উল্লেখ করা হয়েছে। বাদায়েউস সানায়ে কিতাবের ভাষ্যও এরকম।

এখন আমাদের জানতে হবে **إجراء أحكام الكفر** এর কী অর্থ এবং আবূ হানীফা রঃ এর শর্তগুলোর বাস্তবতা কী।

শরহুয যিয়াদাত কিতাবে কাযী খান রঃ -মৃত ৫৯২হিঃ- ইমাম মুহাম্মদের উপরোক্ত ক্বাওলের ব্যাখ্যায় বলেন,

إن الدار إنما تنسب إلى أهلها باعتبار الولاية واليد ، وإجراء الأحكام يدل على الولاية ، فتثبت النسبة.

কোন অঞ্চল তার অধিবাসীদের দিকে নিসবাত করা হয় ক্ষমতা এবং শক্তির ভিত্তিতে। আহকাম বাস্তবায়ন করা এটা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে বুঝায়। তাই এর দ্বারাই নিসবাত সাব্যস্ত হবে। (অর্থাৎ ক্ষমতা কাফেরদের হলে দারুল হরব, অন্যথায় দারুল ইসলাম।)

রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রঃ আরো সাফ করে বলেন,

كيونكه اجرائے احكام سے شوكت وغلبه مراد هے نه سركاري ملازمين وحكام كي اجازت سى مراسيم دين كي ادائيگي- باقيات فتاوى رشيديه ص٥٥٣

অর্থাৎ জুমু'আ, ঈদ, জামাতসহ অন্যান্য শা'আইরে ইসলাম পালন করা না করার দ্বারা কিছু যায় আসে না। কেননা **إجراء احكام** দ্বারা উদ্দেশ্যই হলো শাওকত ও গালাবা। সরকারি কর্মকর্তা এবং শাসকদের অনুমতি নিয়ে ইসলামের বিধি-নিষেধ পালন করতে পারলে এই হুকুমের মাঝে কোন পার্থক্য আসবে না। - ফাতাওয়ায়ে আযীযী পৃ:৪৫৫

এমনকি কোন এলাকা যদি এমন হয় যে, সেখানে কাফেরদের পূর্ণ দখলদারিত্ব পাওয়অ গেছে। মুসলমানদের ক্ষমতা একেবারে শেষ হয়ে গেছে এতদসত্ত্বেও কাফেররা ঐ অঞ্চলে তাদের একটিও কুফুরী আইন বাস্তাবায়ন করেনি, বরং ঐ অঞ্চলেরই কোন একজন মুসলমানকে শাসক বানিয়ে বলে দিল, তুমি তোমার ধর্মের নিয়মানুযায়ী শাসনকার্য চালিয়ে যাও তবে ক্ষমতা আমাদের হাতে থাকবে।

যেমন ১৯৩৫ সালে ভারত শাসনের ক্ষেত্রে ইংরেজরা এক নতুন প্রক্রিয়া চালু করে। যার নাম দেয়া হয় ''ইন্ডিয়ান এ্যাক্ট"। এই এ্যাক্ট এর সার কথা ছিল, প্রদেশ ভিত্তিক নির্বাচন হবে। এই নির্বাচনে মুসলিম প্রদেশ গুলোতে মুসলিম গভর্ণর নির্বাচিত হবেন। হাতে গোনা কয়েকটি বিভাগ যেমন পররাষ্ট্র বিভাগ, স্বরাষ্ট্র বিভাগ, প্রচার বিভাগ ও যোগাযোগ বিভাগ এগুলো ইংরেজদের নিয়ন্ত্রনে থাকবে। এছাড়া অন্যান্য সকল বিভাগ প্রাদেশিক সরকারের ও কেন্দ্রের হাতে ন্যাস্ত থাকবে।

উল্লিখিত সুরতেও ঐ অঞ্চল দারুল হরবই থাকবে। মূল ক্ষমতা কাফেরদের হাতে থাকার কারণে।

এখানে আমরা বারবার একটি কথাই বোঝানোর চেষ্টা করছি যে, শাসন কার চলে না চলে আমরা ইসলামী আহকামগুলো পালন করতে পারি কি না, এর সাথে হুকুমের কোন সম্পর্ক নেই। বরং মূল বিষয় হলো, ক্ষমতা কার হাতে। ব্যাস। (ফোকাহায়ে কেরাম এ কথাটিই বুঝাতে চেয়েছেন) (বাকিয়াত পৃ:৫০১)

আমরা একটু আগে বলে এসেছি যে, যে অঞ্চলে কাফেরদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর মুসলমানদের ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে।

এই ২য় কথাটির অর্থ আমাদের বুঝতে হবে। কেননা এর মাধ্যমে আবূ হানীফা ও সাহেবাইনের মাঝে এখতেলাফের কারণ এবং আবূ হানীফা রঃ এর অতিরিক্ত শর্ত সমূহের বাস্তবতা বুঝে আসবে।

مگر غلبه اقتدار بالكل ختم هونے كي كيا حد هے اس ميں همارے ائمه فقه كے درميان اختلاف هے ۔ صاحبين فرماتے هيں.....

প্রথমে রশীদ আহমদ গাঙ্গহী রঃ এর কথা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে, হযরত বলেন,
ক্ষমতা একেবারে নিঃশেষ হবার সীমা কতটুকু এ নিয়ে আমাদের ইমামগণের মাঝে এখতেলাফ রয়েছে।

সাহেবাইন বলেন, কাফের মুসলিম উভয় দলই যদি নিজেদের ক্ষমতা, নিজেদের বিধান, বিচার আচার গুলো কার্যকর করতে পারে তাহলে বুঝা যাবে মুসলমানদের ক্ষমতা এখনো শেষ হয়নি। তখন **الإسلام يعلو ولا يُعلى** এর কায়েদা মত এটাকে

দারুল ইসলামই ধরা হবে। কিন্তু যদি এর জন্য মুসলমানরা কাফেরদের থেকে অনুমতি নিতে হয় (যদিও তা মৌন সমর্থনই হোকনা কেন, অর্থাৎ মুসলমানরা তাদের হুকুমগুলো পালন করে যাচ্ছে কিন্তু কাফেররা বাধা দেবার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও বাধা দিচ্ছে না) তাহলে ধরা হবে এখানে মুসলমানদের আর কোন ক্ষমতা বাকী রইল না।

আর আবূ হানীফা রঃ সূক্ষ্ম দৃষ্টির কারণে **استحسانًا** এই মত পোষণ করেছেন যে, কোন দারুল ইসলামকে দারুল হরব ঘোষণা দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। তাই যতক্ষন পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে ইসলামী গালাবার নিশানাসমূহ হতে সামান্য নিশানাও বাকী থাকে এবং কাফেরদের ক্ষমতা বিস্তারের মধ্যে একটুও দূর্বলতা পাওয়া যায় ততক্ষন তাকে দারুল হরব ঘোষণা দেয়া হবে না। অতিরিক্ত শর্তদ্বয়ের প্রথম শর্ত, মাঝখানে কোন দারুল ইসলাম থাকা এটা কাফেরদের ক্ষমতা বিস্তারের পথে এক ধরণের বাধা। কারণ যে যেকোন সময় পার্শ্বস্থ দারুল ইসলামের লোকেরা হামলা চালিয়ে অত্র অঞ্চল কাফেরদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে।

অধিকন্তু হযরত বলেছেন, এ শর্তটির সম্পর্ক ছোট ছোট বসতী ও শহরের সাথে। কোন রাষ্ট্র বা বড় এলাকার জন্য এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না। (বাকিয়াত পৃ: ৫০৪) আর ২য় শর্ত তথা মুসলিম শাসক থেকে অর্জিত আমান বাকি থাকা। এর দ্বারাও উদ্দেশ্য হলো মুসলিম শাসকের ক্ষমত বাকি থাকা। কারণ এই আমানের হাকীকত হল মুসলিম শাসকের ভয়ে এসে অপরের অনিষ্টসাধন থেকে বিরত থাকা। শাসক ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে তো এই ভয় বাকী থাকার প্রশ্নই আসে না।

উক্ত বিষয়টি 'শরহুয যিয়াদাত' কিতাবে আরো গোছালো ভাবে বলা হয়েছে। খ:৬ পৃ:২০২৩

ولأبي حنيفة رح ان الدار إنما تنسب إلى أهل الحرب عند ظهور قدرة أهل الحرب وغلبتهم وقوتهم ولا تظهر إلا عند وجود هذه الشرائط كلها ، أما عند عدم بعضها كانت الدلائل في حد التعارض.....

আহলে হারবের দিকে রাষ্ট্রর নিসবাত তাদের ক্ষমতা ও শক্তির ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। আর এই সবগুলো শর্ত পাওয়া গেলেই তাদের ক্ষমতাটা সুস্পষ্ট হয়। কোন

একটা শর্ত অনুপস্থিত হলে দলীলের মধ্রে বিরোধ দেখা দেয় (বিধায় তাদের গালাবার নিশ্চয়তা লাভের জন্য এ শর্তগুলো প্রয়োগ করা হয়।)

এ বিষয়টি হুবহু ঐ হাদীসের মতই যেখানে বলা হয়েছে তোমাদের কারো যদি পেছনের রাস্তায় কিছু বের হবার অনুভুতি হয় তাহলে আওয়াজ শোনা অথবা দুর্গন্ধ পাওয়া ব্যতীত নামায ছাড়বেনা। এই হাদিসে আওয়াজ শোনা ও দুর্গন্ধ পাওয়ার শর্ত শুধুমাত্র নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে তার বাতাস বের হয়েছে। অন্যথায় যদি কেউ এ দুটি ছাড়াও নিশ্চিত হয়ে যায় তবে তার জন্য নামায জারি রাখা বৈধ হবে না।

কাফেরের গালাবা হলে দারুল ইসলাম দারুল হরব হয়ে যায়। এটা কি শুধু ভিনদেশী কাফেরের হামলার মাঝেই সীমাবদ্ধ না এর আরো সুরত রয়েছে ?

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে খ:২ পৃ:২৪৮ বলা হয়েছে:

وصورة المسئلة على ثلاثة أوجه ، إما أن يغلب أهل الحرب على دار من دورنا أو ارتدّ أهل مصر وغلبوا وأجروا أحكام الكفر أو نقض أهل الذمة العهد وتغلبوا على دارهم.

দারুল ইসলাম দারুল হরবে পরিণত হওয়ার তিনটি সূরত রয়েছে:

১. ভিনদেশী আহলে হরব আমাদের কোন দারুল ইসলামে হামলা করে তাতে ক্ষমতা বিস্তার করল।

২. কোন শহরবাসী মুরতাদ হয়ে ঐ শহরের ক্ষমতা দখল করল এবং তাতে কুফুরী শাসন বাস্তবায়ন করল।

৩. যিম্মীরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে শহরের ক্ষমতা দখল করল।

এই তিন সুরতের যে কোন এক সুরত পাওয়া গেলেই সে অঞ্চল দারুল হরবে পরিণত হবে।

আমভাবে দারুল হরবের পরিচয় লাভের পর এবার আমরা বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান নিয়ে একটু পর্যালোচনা করে দেখি:

কেউ কি এই দুঃসাহস দেখাতে পারবে যে বলবে ''বাংলাদেশে ইসলামী শাসন চালু আছে।"

এটা একটা স্পষ্ট ও চাক্ষুস বিষয় যে বাংলাদেশের সংবিধান হল কুফুরী সংবিধান। এতে যদি কারো সংশয় থাকে তাহলে ইসলামের মৌলিক বিষয়ে যে জ্ঞান রাখে সে যেন একটু কষ্ট করে বাংলাদেশের সংবিধানটা আদ্যোপান্ত পড়ে নেয়। বিশেষ করে অনুচ্ছেদ সাতের ধারা এক ও দুই, অনুচ্ছেদ ৬৫ এর ধারা ১, অনুচ্ছেদ ৭৫ এর ধারা ১ এর খ, অনুচ্ছেদ ৮০ এর ধারা ১,২,৩,৪,৫ অনুচ্ছেদ ৪৮ এর ধারা ২, অনুচ্ছেদ ৫৯ এর ধারা ১, অনুচ্ছেদ ৫৮ এর ধারা ২, অনুচ্ছেদ ৫৫ এর ধারা ২, অনুচ্ছেদ ১৪২ এর ধারা ১, অনুচ্ছেদ ২৮ এর ধারা ১,২ অনুচ্ছেদ ২৬ এর ধারা ১,২ অনুচ্ছেদ ২৯ এর ধারা ১,২ অনুচ্ছেদ ৩৯ এর ধারা ১,২ক অনুচ্ছেদ ৩২ এবং ৪৯। এখানে সহজের জন্য কিছু অনুচ্ছেদ ও ধারার কথা উল্লেখ করলাম। তবে পুরা সংবিধান পড়ে নিলে আরো সাফ হবে।

যখন এদেশে শাসনও কুফুরী অথচ ফোকাহায়ে কেরাম দারুল ইসলামের পরিচয় দিতে গিয়ে সবাই উল্লেখ করেছেন, যেখানে **إجراء أحكام الإسلام** পাওয়া যায় তাই দারুল ইসলাম। যেমন আমরা শুরুতে **جامع الرموز** এর ইবারতে উল্লেখ করেছি।

কেউ বলবেন, আপনিই না বলেছেন, **إجراء أحكام الإسلام** দ্বারা **غلبة المسلمين** উদ্দেশ্য, হুকুম চলুক বা না চলুক এর উপর মাসআলার ভিত্তি নয়। হ্যা, আমরা বলেছি, এখানেও আমি সরাসরি এ কথাটা দিয়ে শুরু করতে পারতাম। কিন্তু আলোচনার সকল দিক বুঝে আসার জন্য আমরা একটু দূর থেকে আসলাম। আসলেই মূল উদ্দেশ্য হল অঞ্চলটা কাদের ক্ষমতাধীন।

যেমনটা আমরা পূর্বে বিশদ আলোচনা করেছি এবং আল্লামা সারাখসী রঃ ও শরহুস সিয়ারিল কাবীরের মধ্যে সাফ করে বলেছেন,

فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين .

দারুল ইসলাম এমন ভূমীকেই বলে যা মুসলমানদের ক্ষমতাধীন থাকে। (চাই তারা সেখানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করুক বা না করুক।)

এবার আমাদের সমাধানে পৌছতে হলে ক্ষমতাসীনদের দিকে তাকাতে হবে। এই ক্ষমতাসনিদের শরঈ হুকুম যদি আমরা সঠিকভাবে বুঝতে না পারি তাহলে এতক্ষনের এ দীর্ঘ আলোচনা সবই পন্ড ও অর্থহীন। তবে আলোচনার বিস্তৃতি

অনেক বেড়ে যাওয়ায় আমরা এখানে শুধু ক্ষমতাসীনদের হুকুম আলোচনা করে সমাধানে পৌছতে চাই।

আমাদের বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীসহ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী অন্যান্য সংসদ সদস্য মুরতাদ। সে মতে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে বর্ণিত দারুল হরব হবার তিন সুরতের ২য় সুরত এখানে পাওয়া যাওয়ার ভিত্তিতে বাংলাদেশ বর্তমানে দারুল হরব।

সবশেষে আমরা এ দাবী সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী করনের নিমিত্তে সামান্য কিছু দালিলিক আলোচনা করবো।

১. মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী রঃ কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, হযরত! ইংরেজদের যামানায় হিন্দুস্তান আপনাদের মতে দারুল হরব ছিল কি ? ইংরেজদের পর বর্তমান সময়ে আগের হুকুমে কোন পার্থক্য এসেছে কি ?

হযরত জবাবে বললেন, হ্যা আমাদের মতে হিন্দুস্তান দারুল হরব ছিল ঐ সকল দলীলের ভিত্তিতে যা হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রঃ ও শাহ আব্দুল আযীয রঃ লিখে গেছেন। বর্তমান যমানায়ও হিন্দুস্তান দারুল হরব। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কারণে তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়নি। (ফাতাওয়ায়ে মাহমূদীয়া খ:২০ পৃ:৩৬০)

এখানে হযরতের সর্বশেষ বাক্যটি লক্ষ্যনীয়। কারণ অনেকের সংশয় হতে পারে যে, হযরতকে তো হিন্দুস্তান তথা বর্তমান ভারতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। ভারত যেহেতু হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ তাই দারুল হরব হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদেরর বাংলাদেশে তো সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান। আমরা বলবো, আপরি হযরতের শেষ বাক্যটি আরেকবার পড়ে দেখুন। গণতন্ত্র এটা এমন এক শাসন ব্যবস্থা যা ধর্ম বিভেদ, রাষ্ট্র বিভেদ ও পরিবেশ বিভেদে এর মূল কাঠামোতে কোন পরিবর্তন আসে না। জনৈক রাষ্ট্র বিজ্ঞানীর ভাষায় ''গণতন্ত্র এমন এক সর্বগ্রাসী মতবাদ যা তার পূর্বের পৃথিবীর সকল ধর্ম, মতবাদ ও বিশ্বাসকে হজম করে ফেলেছে।

২. আহসানুল ফাতাওয়ায় খ:৬ পৃ:২১ হযরত রশীদ আহমদ লুধীয়ানবী রঃ বলেন,

جس ملك ميں اگر چه عملا احكام اسلام كا نفاذ نه هو مگر تنفيذ احكام پر قدرت هو وه دارالاسلام هے۔

কোন দেশে যদিও কার্য্যত ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত নয় কিন্তু প্রতিষ্ঠা করার সামর্থ রয়েছে (তথা ইসলামী সরকারের হাতে ক্ষমতা যে কোন মুহূর্তে চাইলেই সে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে) তাহলে তা দারুল ইসলাম।

আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন,

جہاں احکام اسلام کي تنفیذ پر قدرت نه هو وه دار الحرب هے۔

কিন্তু যেখানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার শক্তি নেই তা দারুল হরব। অনুরূপ কথা হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীও বলেছেন। (বাকীযাত পৃ: ৫০৪)

আমরা একটু বাস্তব অবস্থার দিকে তাকাই। আমাদের দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পথে সবচে' বড় বাধা হলো এই মুরতাদ শাসকগোষ্ঠি। আর জনগণ কি এই অবস্থানে রয়েছে যে, যে কোন মুহূর্তে চাইলেই তারা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এমন বাস্তব বিরোধী কথা বা মনোভাব কে পোষণ করতে পারে।

যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত নয় খালেছ একটি দ্বীনী দাবী তথা নাস্তিকদের শাস্তি প্রদানের দাবীতে গণতন্ত্র স্বীকৃত আন্দোলন করেও যে শত শত লাশ গুনতে হয় সেখানে যারা এমন মনোভাব পোষণ করে তাদের ব্যাপারে আমরা অধমরা আর কী বলতে পারি। অথচ সমকালিন প্রসিদ্ধ আলেমদের কয়েকজন এরকম মনোভাব থেকেই মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোকে দারুল ইসলাম ফতোয়া দিয়েছেন।

দলীল স্বরূপ তারা শামীর এবারত নকল করেছেন:

وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض البلاد التابعة كلها دار إسلام، لانها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دينهم وبعضهم يعلنون بشتم الاسلام والمسلمين، لكنهم تحت حكم ولاة أمورنا، وبلاد الاسلام محيطة ببلادهم من كل جانب وإذا أراد ولي الامر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها .

অনুবাদ: এর দ্বারা এ বিষয়টি সুস্প হল যে, শামে জাবালে তাইমুল্লাহ নামে যে অঞ্চল রয়েছে যাকে অন্য নামে জাবালুদ দুরুজও বলা হয় সেসব এলাকা ও তার অধীনস্থ এলাকা সমূহ সব দারুল ইসলাম। কেননা ঐ সকল এলাকায় যদিও খৃস্টান

ও দুরুজী শাসকরা বিদ্যমান এবং এমন বিচারক রয়েছে যারা তাদের ধর্ম অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করে এমনকি তাদের কতক ইসলাম ও মুসলামনদের প্রকাশ্যে গালি দেয়। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও তারা যেহেতু আমাদের মুসলিম শাসকদের হুকুমের অধীন এবং তাদের এই অঞ্চলগুলো চতুর্দিক থেকে দারুল ইসলাম দ্বারা বেষ্টিত এবং আমাদের মুসলিম শাসক যখনই ইচ্ছা করে ঐ অঞ্চরগুলোতে আমাদের ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। (তাই এই তিন কারণে ঐ অঞ্চলগুলোর উপর দারুল হরবের হুকুম আরোপ করা হবে না।)

আমরা আমাদের বাংলাদেশের অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখি, যেই তিনটি বিষয় পাওয়া যাওয়ার কারণে শামের ঐ অঞ্চলগুলোকে দারুল ইসলাম বলা হয়েছে তার কোন একটাও আমাদের দেশের বেলায় পাওয়া যায় কি না।

৩. বনী ইয়ারবু' নামক আরবের এক অঞ্চলকে হযরত সিদ্দীকে আকবরের যুগে দারুল হরব ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অথচ সেখানে জুমা, ঈদ ও আযান বহাল ছিল। সে অঞ্চলের মানুষ শুধু যাকাত অস্বীকার করেছিল। (জামেউল ফাতাওয়া খ:৮ পৃ:৩২২)
সব আদায় করে শুধু যাকাত অস্বীকারের কারণে যদি সে অঞ্চল দারুল হরব ঘোষিত হয় তাহলে আইন করে, ক্ষমতা বলে যারা মদের হারাম, যিনার হারাম, সুদের হারাম হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করে, ফরয নামায, রোযা ও যাকাতকে যারা ফরযের স্তর থেকে নামিয়ে রাষ্ট্রিয় ভাবে শুধু বৈধ রেখেছে।

বাক স্বাধীনতার নামে নবী-রাসূল, আল্লাহ ও শা'আইরে ইসলাম নিয়ে ব্যাঙ্গ করার বৈধতা দিয়েছে, তাদের নিরাপত্তার জন্য হাজার হাজার বাহিনী মোতায়েন করেছে। তাদের ক্ষমতাসীন দেশ যদি দারুল হরব না হয় তাহলে কোরআন, হাদীস, সীরাতসহ ইসলামের সকল পরিভাষার কোন সঠিক প্রয়োগক্ষেত্র থাকে বলে আমার বুঝে আসে না।

সারকথা: দারুল হরব হলো, যেখানে কাফেরের ক্ষমতা বিরাজমান থাকে এবং ইসলামের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়। এর হদ্দ ও মাপকাঠি কী তা নিয়ে ওলামায়ে আহনাফের মাঝে এখতেলাফ। সাহেবাইনের মতে শুধু কুফুরী শাসন প্রতিষ্ঠ করাই যথেষ্ট। আবূ হানীফা রঃ সতর্কতাবশতঃ আরো দুই শর্ত আরোপ করেন। তবে

সকলের উদ্দেশ্য একই। বাংলাদেশ ও এ জাতিয় অন্যান্য মুসলিম দেশ (অধিকাংশগুলোই) দারুল হরব, শাসকবর্গ মুরতাদ হওয়ার কারণে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?২৫৬২

ঈমানী আকায়েদ ও শরিয়তের স্পষ্টভাবে ঘোষিত বিষয়ের বিকৃতি ও অপব্যখ্যা অস্বীকারেরই এক প্রকার

আবুল ফিদা

Senior Member

০৬-২০-২০১৬

ঈমানী আকায়েদ ও ইসলামের বিধি-বিধান সমূহ অস্বীকার করা, অবজ্ঞা ও বিদ্রুপ করা যেমন কুফর, তেমনি এগুলোর কোন একটির ও এমন কোন ব্যাখ্যা করাও সরাসরি কুফর, যার দ্বারা তার প্রকৃত অর্থই বদলে যায়। কোন কিছুর অপব্যখ্যা ও অর্থের বিকৃতি হচ্ছে ঐ বিষয়টি অস্বীকারের ভয়াবহতম প্রকার। ঈমানের বিষয় গুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থেই ঈমান আনতে হবে। নিজের পক্ষ থেকে সেগুলোর কোন অর্থ র্নিধারণ করে বা কোন বেদ্বীনের উদ্ভাবিত অর্থ গ্রহণ করে ঈমানের দাবি করা। সর্ম্পুণ-ঝিনদিকি ও সুস্পষ্ট মুনাফেকী।

যেখানে কোন বিধান ও বিশ্বাসের অর্থ আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর যুগ থেকে অসংখ্য মু'মিনের সুসংহত সূত্রে চলে আসছে ও প্রতি যুগে মুসলিম উম্মাহর ইজমা ও ঐক্যমত বিদ্যমান থাকে সেখানে ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। কারণ সেখানে ঐ অর্থই নিশ্চিত ও র্নিধারিত। ওখানে ভিন্ন ব্যাখ্যার অর্থ ঐ অকাট্য ও প্রতিষ্ঠিত বিষয়কে অস্বীকার করা। যেমন কেহ বললো, নামাজ সত্য কিন্তু আসল নামাজ তা নয় যা মুসলমান প্রচলিত পদ্ধতিতে আদায় করে। আসল নামাজ তো মনের নামাজ, যা দোয়ার অর্থে। যে তা আদায় করতে পারে তার দেহের নামাজের প্রয়োজন নেই (নাউযুবিল্লাহ) ।

কিংবা বললো ইসলাম মানে শান্তি, বিধায় ইসলাম র্ধম মানে শান্তির র্ধম, তাই তাতে যুদ্ধ নেই, সংঘাত নেই,রক্তপাত নেই,মারামারি নেই।অতএব যারা র্ধমীয় উম্মাদনায় প্রভাবিত হয়ে যারা যুদ্ধ, জিহাদ,গুপ্ত হত্যা ও আত্মঘাতি আক্রমণ করার মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি শাধন করে তারা সন্ত্রাস, আর এ সন্ত্রাসী র্কাযকলাপকে ইসলাম সর্মথন করে না। কিংবা বললো, শসস্ত্র জিহাদের তুলনায় নফসের জিহাদই বড় জিহাদ। অতএব ছোট জিহাদের (অস্ত্রর) প্রতি মনোনিবেশ

না করে বড় জিহাদে অর্থাৎ নফসের কন্ট্রলের দিকে আত্মনিয়োগ করা উচিৎ বলে শসস্ত্র জিহাদকে অস্বীকার করে।

কিংবা বললো, জিহাদ অর্থ চেষ্টা, সুতরাং আমরা মিছিল মিটিং, হরতাল-অবরোধ, দাওয়াত ও তাবলীগ ও দরস ও তাদরীস ও লিখনীর মাধ্যমে দ্বীনের বিজয়ের চেষ্টা করছি। অতএব, আমরাতো জিহাদের মধ্যেই আছি,তাই শসস্ত্র জিহাদের প্রয়োজন নেই। কিংবা বললো, নবী (সঃ) আমাদের মত মাটির তৈরীর মানুষ নয়, নবী (সঃ) আল্লাহর জাতি নূরের তৈরী কিন্তু মাটির তৈরি নয়।

কিংবা বলল, আল্লাহ্ যেমন গায়েব জানেন নবী (সঃ) ও তেমন গায়েব জানেন। অথবা বলল, নবী গায়েব জানেন তবে আল্লাহ্ যদি জানায়। কিংবা বলল, আল্লাহ যেমন একি সময় মব জায়গায় হাজির নাজির তদ্রুপ নবী ও একি সময় সব জায়গায় হাজির নাজির।

তো এই সব কুফুরী ব্যাখ্যা এবং এজাতীয় আরও অসংখ্য ব্যাখ্যা আছে যার দ্বারা ইসলামের অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করা হয়। আর এ অস্বীকারকে গোপন করার জন্য অপব্যাখ্যা করে নিজেদেরকে সাধারণ কাফিরের চেয়েও ভয়াবহ প্রকারের কাফির, মুলহিদ, যিন্দীক ও মুনাফিকের সারিতে অন্তর্ভূক্ত করে।

সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালার নিম্নের সাবধান বাণীর প্রতি গভীরভাবে নজর দেওয়া উচিৎ। যাতে সংশোধনের পথ খুলে যায়:-

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

অর্থ: যারা আমার আয়াত সমূহকে (অপব্যাখ্যার মাধ্যমে) বিকৃতি করে তারা আমার অগোচরে নয়। শ্রেষ্ঠ কে যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে-না যে কিয়মতের দিন নিরাপদে থাকবে সে? তোমাদের যা ইচ্ছা কর; তোমরা যা কর তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা। সূরা হামীম আস সাজদা আয়াত:-৪০

দ্বীনকে অপব্যাখ্যা হতে রক্ষা জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের সর্বসম্মত পথ যে মানদন্ড বানিয়েছেন । এবং মুমিনের সর্ব সম্মত পথ থেকে বিচ্যুতিকে রাসূল (সঃ) এ বিরুদ্বতার মতো জাহান্নামে যাওয়ার কারণ সাব্যস্ত করেছেন। এ কারনে

ইসলাম আকীদা বা তার বিধানের এমন অপব্যাখ্যার ঠিকানা জাহান্নাম, যা উম্মাহর সর্বসম্মত ব্যখ্যার বিরুধী । যাহা নিম্নে মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি দৃষ্টি দিলে পরিলক্ষিত হয়।

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

অর্থ:- কারো নিকট সুপথ প্রকাশের পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমীনদেরও পথের বিপরীত পথে চলে তবে যে দিকেই সে যেতে চায়, সে দিবেই তাকে পৌছে দেব। এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব, আর তা কত মন্দ আবাসস্থল। সূরা:- আন নিসা, আয়াত:-১১৫

আল্লামা ইবনে কাসির রহ: এই আয়াতের তাফসীরে বলেন,যে ব্যাক্তি মুহাম্মদ (সঃ) এর আনীত শরীয়ত ছাড়া অন্য কো পথি চলল, সেই মুহাম্মদ (সঃ)) এ বিরুদ্ধাচরণ করলো।

اي:ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاءبها الرسول ﷺ فصار في شق

অর্থাৎ:- অনৈসলামিক পন্থায় ইসলাম কিভাবে আসবে? সে তো শুরুতেই রাসূল (সঃ)) এ পন্থা থেকে সবে রাসূল (সঃ)) এর বিরুদ্ধাচরনের রাস্তা গ্রহণ করেছে; দুনিয়া ও আখিরাতে কে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে।

ইবনে জারীর তাবারী রহ্. উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন,

ويتبع طريقاغيراهل الصديق ويسلك منهاجا غيرمنهاجهم-وذلك هوالكفر بالله لان الكفربالله ورسوله غير سبيل المؤمنين

অর্থ:- ঈমানদারদের পথ ছেড়ে অন্য কোন পথে চলা, তাদের নীতি ছেড়ে অন্য কোন নীতি গ্রহণ করা,এই টাই আল্লাহর সাথে কুফুরী । কেননা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের সাথে কুফুরী করা ঈমানদ্বারদের পথ ও নীতি নয় ।

কাজী ছানাউল্লাহ্ পানিপতী রহ্ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

اي:نجعله في الدنياواليا لما تولىمن الضلال

অর্থ:- যে গোমরাহী তারা অবলম্বন করেছে, আমি দুনিয়ার মধ্যে ঐ গোমরাহীকে তাদের বন্ধু বানিয়ে দেই।

نوله ماتولي এর ব্যাখ্যা ও তা থেকে শিক্ষা

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ্ এর উদ্দেশ্যে বর্ননা করেন যে, যখন কেহ এই শরিয়ত ছাড়া অন্য পথে চলে, তখন আমি তাকে সে পথেই চলতে দেই। তারা অন্তরে সে পথকে সুন্দর বানিয়ে দেই ও সুসজ্জিত করে দেই। এটা মূলত ক্ষানিকের জন্য অবকাশ দেই। যেমন মহান আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন;

فذرني ومن يكذب بهذاالحديث-سنستدرجهم من حيث لايعلمون

অর্থ:- আমাকে এবং এই বাণীকে যারা মিথ্যা বলেছে; তাদের ব্যাপারটি ছেড়ে দাও। আমি তাদেরকে এমনভাবে ধীরে ধীরে পাকড়াও করবো যে তারা জানতে ও পারবেনা। সূরা:- ক্বালাম, আয়াত:-৪৪

মহান আল্লাহ্ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন; **فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم**
অর্থ:- যখন তারা বক্র পথে চলল, তখন মহান আল্লাহ্ তায়ালা তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। সূরা:- সফ্, আয়াত:-০৫

অপব্যাখ্যার ব্যাপারে ইমাম আবু জাফর ত্বাহাবী রহ্ বলেন,

তার শরহে মা'আনিল আছার কিতাবে আলী (রা) এ রেওয়াতে বর্ননা করেছেন। যারা বিভিন্ন বর্ণনার কয়েকটি ফাতহুল বারীতে 'হদ্দুল খমর' অধ্যায়ে আছে, আলী (রা বলেন, যখন ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) শামের আমীর ছিলেন। তখন, শামের কিছু লোক এই বলে মদপান শুরো করলো যে, আমাদের জন্য তো মদ হালাল তার প্রমান স্বরূপ এই আয়াতটি পেশ করলো:-

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا

অর্থ:- যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তারা যা আহার করেছে তাতে কোন পাপ নেই। সূরা:- মায়েদা, আয়াত:-৯৩

তখন ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রা এই ফিতনা সম্পর্কে হযরত ওমর (রা কে অবহিত করলেন। খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রা তৎক্ষানত ইয়াযিদকে লিখে পাঠালেন; এ লোকেরা ভ্রষ্টতা ছাড়ানোর পূর্বেই তাদেরকে গ্রেফতার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। যখন তাদেরকে বন্দি করে ওমরের (রা কাছে উপস্থিত করা হলো হযরত ওমর (রা সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে এদের ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। সকল সাহাবায়ে কেরাম (রা সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্বান্ত দিলেন যে, হে আমিরুল মু'মিনীন! আমাদের মতামত হল, যেহেতু এরা আয়াতের অপবেক্ষা করে মহান আল্লাহর উপর অপবাদ দিয়েছে, এমন বস্তুকে হালাল বানিয়েছে যার *অনুমতি আল্লাহ তায়ালা কখনো দেননি। অতএব তারা মুরতাদ হয়ে গেছে, আপনি এদের সকলকে হত্যা করে দিন।*

হযরত আলী (রা চুপ ছিলেন। তাই ওমর (রা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার মতে এ লোকদের এমন বিশ্বাস থেকে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হোক । যদি তারা তাওবা করে তাহলে তাদেরকে মদ পানের শাস্তি হিসেবে আশিটি বেত্রাঘাত করে ছেড়ে দেয়া হোক। আর যদি তারা তাওবা না করে তাহলে তাদেরকে (কাফের, মুতাদ হিসেবে) হত্যা করা হোক। কারণ তারা আল্লাহ্‌কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং ইসলামের এমন বস্তুর বৈধতা দিয়েছে যার অনুমতি মহান আল্লাহ তায়ালা দেননি। অত:পর এই রায়ে সকল সাহাবায়ে কেরাম একমত হলেন। এবং ওমর (রা তাদেরকে তাওবা করার নির্দেশ দিলেন। যখন তাওবা করে নিল তাদের মদপানের শাস্তিস্বরুপ ৮০টি বেত্রাঘাত করা হল।

অতএব এই ইজমায়ে সাহাবা দ্বারা পতিয়মান হয় যে, ঈমান, আকাইদ ও শরিয়তের স্পষ্টভাবে ঘোষিত বিষয়ের বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার দ্বারা মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ ও কাফের হয়ে যায়।

সুতরাং অপব্যাখ্যা থেকে বাচার জন্য সাবিলুল মু'মিনীন তথা সাহাবাদের পথের অনুস্মরণ একান্তই জরুরি, কিন্তু এই মানদন্ড মুনাফিকদের কাছে পছন্দনীয় নয়।

তারা ঈমানের দাবি করে, কিন্তু মু'মিনদের মতো ঈমান আনেনা। নিজেদের খেয়াল-খুশি ও সুবিদা মত ঈমান আনে। আর মু'মীনদেরকে মনে করে বুদ্ধিহীন। বর্তমানে একই প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। যেমন মহান আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

অর্থ:- যখন তাদেরকে বলা হয়, যে সকল লোক (সাহাবাগণ) ঈমান এনেছে তোমরাও তাদের মত ঈমান আনয়ন কর। তখন তারা বলে, নির্বোধগন যেমন ঈমান এনেছে আমরাও কি তাদের মত ঈমান আনব? জেনে রাখ এরাই নির্বোধ, কিন্তু তারা নিজেরাও জানেনা (যে তারা নির্বোধ)। যখন তারা মু'মিনদের কাছে আসে তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন নির্জনে তাদের দুষ্ট নেতা ও শয়তানদের সাথে সাক্ষাত করে, তখন তারা বলে আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা তামাশা করি। মহান আল্লাহ ও তাদের সাথে তামাশা করেন এবং তাদেরকে নিজেদের অবাধ্যতায় ভ্রান্ত হয়ে ঘুরার জন্য অবকাশ দেন। সূরা: বাকারা, আয়াত ১৩-১৫

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩২৬৬

"গুপ্ত হত্যার ইসলামি বিধান"- শায়খ ফারিস আল জাহরানি

Boktiar

Member

০৬-২৩-২০১৬

بسم الله الرحمن الرحيم

আলহামদু লিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ। গুপ্ত হত্যাকে আরবী ভাষায় বলা হয় 'আল ইগতিয়াল' যার বহু বচন হল 'আল ইগতিয়ালাত' আর ইংরেজী ভাষায় একই অর্থ বুঝাতে ব্যবহার হয় 'Assassination' শব্দ। বাংলা ভাষায় এর শাব্দিক অর্থ হলো অপ্রস্তুত অবস্থায় অতর্কিত আক্রমন করে কিংবা গোপন কোন কৌশলে কাউকে হত্যা করা। ইসলামী পরিভাষায় 'ইগতিয়াল' বলা হয় ইসলাম ও মুসলমানদেরকে কারো চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা এবং অন্য কেউ যেন ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করার দুঃসাহস না পায় তার জন্য দৃষ্টান্তমুলক শাস্তিস্বরূপ অতর্কিতে আক্রমন করে কিংবা গুপ্তভাবে কাউকে হত্যা করা।

গুপ্ত হত্যা শুধুই কোন সামরিক কর্মকাণ্ড নয়; বরং গুপ্ত হত্যা হল যুগপৎ খুবই কার্যকরী একটি সামরিক কৌশলও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

.১) যে ব্যক্তি এ কাজ করবে তাকে অবশ্যই সঠিক ইসলামী আকীদার ধারক হতে হবে।

২) যাকে হত্যা করা হবে তাকে অবশ্যই ইসলামী শরিয়া মোতাবেক এই শাস্তির উপযুক্ত হতেহবে অর্থাৎ শুধু হত্যা যোগ্য অপরাধ হলেই চলবে না যেমন ব্যভিচার বা হত্যা; বরং নিশ্চিতভাবে এমন প্রকৃতির অপরাধী হতে হবে যার উপর এই শাস্তি প্রয়োগের বৈধতা রয়েছে।

ইসলামী শরিয়াতে গুপ্ত হত্যার বৈধতা

মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের জীবনী অধ্যয়ন করলে একথা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তাদের জিহাদ তথা সামরিক কৌশল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গুপ্ত হত্যা ছিলো একটি শিল্প হিসেবে বিবেচ্য বিষয় এবং তাদের সামরিক কর্মকাণ্ডের একটি অন্যতম অংশ। আল্লাহর পথে জিহাদ ও জিহাদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হুকুম আহকাম ইসলামে যেমন সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তেমনি একই হুকুমের আওতাভুক্ত হবে গুপ্তহত্যার এই শিল্প কলা। আমরা এই আলোচনায় কাফেরদের নেতৃস্থানীয় যে সব লোকেরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলো, যেসব লোকেরা আল্লাহতায়ালা এবং তাঁর রসুলকে কষ্ট দিয়েছিল তাদেরকে হত্যার কিছু ঘটনা তুলে ধরবো, এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কুরআন ও হাদিসের ভাষ্যসমুহ উপস্থাপন করব, সালাফ আস সালেহীন ওলামায়ে কেরামগন তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কিতাব সমুহে এসব ভাষ্য ও ঘটনা থেকে যেসব ফিকহী মাসআলা মাসায়েল বের করেছেন তা পেশ করবো। আমাদের পাঠকদের সদয় অবগতির জন্য মুল আলোচনা আরম্ভ করার আগেই স্বরণ করিয়ে দিতে চাই যে,

"আইম্মাতুল কুফুর' বা কুফুরের নেতাদের গুপ্তহত্যার বৈধতা এমনই একটি স্বতঃসিদ্ধ মাসআলা যে সালাফ আস সালেহীনদের কেউই এর বৈধতার ব্যপারে দ্বিমত পোষণ করেননি।"

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গুপ্ত হত্যার দলীলঃ

১ম দলীলঃ কাফির মুশরিকদের হত্যার সাধারণ বিধান:-

আল্লাহ রব্বুল আলামিন ঈমানদারদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন-

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ

তোমরা মুশরিকদেরকে হত্যা করো যেখানেই তাদেরকে পাও, তাদেরকে ধরো, তাদেরকে বেঁধে ফেলো, তাদেরকে হত্যার জন্য ঘাটিতে ওঁত পেতে অপেক্ষা করতে থাকো। (সূরা আত তাওবা, আয়াত ৫)

এ আয়াতে গুপ্ত হত্যার বৈধতার দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। ইমাম কুরতুবী রহঃ এ আয়াতের 'উকু'দু লাহুম কুল্লা মারসদ' এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো,

اقعدوا لهم في مواضع الغرة حيث يرصدون

অর্থাৎ তাদের উপর আক্রমন করার জন্য, তাদেরকে হত্যা করার জন্য, অতর্কিতে তাদের উপর আক্রমনের জন্য গোপন ঘাটিতে ওঁত পেতে থাকো।

এরপর ইমাম কুরতুবী রহঃ বলেন,

وهذادليل على جواز اغتيالهم قبل ا لدعوة

অর্থাৎ এ আয়াতের মধ্যে এ কথার স্বপক্ষে দলীল রয়েছে যে মুশরিদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পূর্বেও হত্যা করা বৈধ। (তবে মনে রাখা দরকার যে এ হুকুম কেবল রক্ষণাত্নক জিহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; কেননা আক্রমনাত্নক যুদ্ধের ক্ষেত্রে অবশ্যই আক্রমন শুরু করার পূর্বে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে।) এই আয়াত কুফফারদের ধরার জন্য গোপন ঘাটি তৈরী, তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করা ও তাদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করার বৈধতা দেয়। এ কারণে মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত আলেম ও ফকীহ ইমাম ইবনুল আরাবী রহঃ তার তাফসীর গ্রন্থ আহকামুল কুরআনে বলেন, 'আমাদের ফকীহগন তাদেরকে হত্যার জন্য ওঁত পেতে থাকা এবং তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দেয়ার পূর্বে গুপ্তভাবে হত্যা করা প্রসঙ্গে বলেন যে এ হত্যার ব্যপারে যথেষ্ট মজবুত দলীল প্রমাণ রয়েছে'। ইমাম ইবনে কাসীর রহঃ তার তাফসীর গ্রন্থে এর ব্যখ্যা প্রসঙ্গে বলেন –

وَقَولُهُ : (وَاحْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ) أي لاتَكْتَفُوا بِمُجَرَّدِ وُجْدَانِكُمْ لَهُمْ ، بَلْ اُقْصُدُوهُمْ بِالْحِصَارِ فِي مَعَاقِلِهِمْ وَحُصُونِهِمْ وَالرَّصْدِ فِي طُرُقِهِمْ وَمَسالِكِهِمْ حَتَّى تُضَيِّقُوا عَلَيْهِمُ الْوَاسِعَ وَتَضْطَرُّوهُمْ إِلَى الْقَتْلِ أَوِ الإِسْلاَمِ،

অর্থাৎ 'তাদেরকে তোমাদের হাতের নাগালে পেয়ে তারপর হত্যা করবে শুধু এমন চিন্তা করে বসে থাকা যথেষ্ট নয়; বরং এ আয়াত বলছে যে তোমরা তাদের বাড়ি ঘরে, তাদের শহর নগরে গিয়ে তাদেরকে আক্রমন করো, ঘাটি স্থাপন করো, ওঁত পেতে থাকো, তাদেরকে ঘিরে ফেলে অবরোধ করে রাখো যাতে করে পৃথিবী প্রশস্ত

হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং তারা এমন এক অবস্থার মধ্যে পড়ে যায় যে হয় যুদ্ধ করতে হবে অথবা ইসলাম গ্রহণ করতে হবে'।

বিংশশতাব্দিতে বিশ্বব্যপি জিহাদকে পুনরুজ্জীবনের প্রান পুরুষ মুজাহিদ শায়খ শহীদ ডঃ আব্দুল্লাহ আযযাম রহঃ তার সুরা আত তাওবার তাফসীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত প্রমাণ করে যে কুফফারদেরকে সতর্ক করার পূর্বেই তাদেরকে গুপ্তভাবে হত্যা করা জায়েয; আর এখানে যেহেতু আল্লাহ তায়ালা একাজের হুকুম দিয়েছেন অতএব গুপ্ত হত্যার আমল একটি সুস্পষ্ট বোধগম্য ফরয হুকুম।

২য় দলীলঃ কিসাস বা সমান শাস্তির বিধান প্রয়োগ:-

আল্লাহরব্বুল আলামিন এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে বলেন-

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ

যে তোমাদের উপর বাড়াবাড়ি করেছে তোমরাও তার উপর ঠিক ততো খানি বাড়াবাড়ি করবে যতো খানি তারা তোমাদের উপর করেছে।(সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৯৪)

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

(ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য হল) তারা যখন অন্যায় বাড়াবাড়ির শিকার হয় তখন তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে; আর দুষ্কৃতির বদলা হল তার সমপরিমাণ দুষ্কৃতি; তবে (কল্যাণকর মনে করে) যে মাফ করে দেবে এবং সংশোধন করে দেবে তার বিনিময় আল্লাহর কাছে রক্ষিত; নিশ্চয়ই তিনি যালিমদেরকে মোটেই ভালোবাসেন না। আর যুলমের শিকার হয়ে যদি কেউ প্রতিশোধ গ্রহণ করে তবে তাদের উপর কোন অভিযোগ দায়ের করা চলবে না; অভিযোগ তো কেবল তাদের উপর যারা মানুষের উপর যুলুম করবেএবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে বেড়াবে; তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (সূরা আশ শূরা, আয়াত ৩৯-৪২)

আর তোমরা যদি তোমাদের শত্রুদেরকে শাস্তি দাও তাহলে ঠিক সেইভাবে তাদেরকে শাস্তি দিবে যেভাবে তারা তোমাদের উপর আক্রমন করেছে। (সূরা আন নাহল, আয়াত ১২৬)

এ সকল আয়াত সমুহ বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে নাযিল হলেও এর সামগ্রিক হুকুম সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য। কেননা আল কুরআনের কোন আয়াত বিশেষ কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হলেও সে আয়াতের হুকুম কেবল সেই ঘটনার সাথেই খাস নয় বরং একই রকম সকল ঘটনার ক্ষেত্রেই সে আয়াতের হুকুম সমান ভাবে জারী থাকবে। এ ব্যপারে ইসলামের মূলনীতি হল

العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب। অর্থাৎ শিক্ষা গ্রহণ করা হবে শব্দের সাধারণ অর্থের উপর ভিত্তি করে; শুধু আয়াত নাযিলের ঘটনার সাথে হুকুমকে খাস করা হবে না।

অতএব আজ কুফফাররা যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোপন অভিযান পরিচালনা করে, গুপ্তচর বৃত্তি করে, ড্রোন আক্রমন করে মুসলিম জাতির বীর সন্তান মুজাহিদদেরকে হত্যা করে, নারী শিশু সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে নির্বিচার হত্যা করে তাহলে আমাদের পক্ষেও যেভাবে সম্ভব আমরা তাদেরকে আমাদের গুপ্ত হত্যার শিকারে পরিণত করবো, আমরাও তাদের নেতাদেরকে হত্যা করবো, তাদের বেসামরিক সাধারণ মানুষ ওনারী শিশুদেরকে হত্যা করবো। তারা যদি আমাদের শহর নগর বন্দরে বোমা বর্ষণ করে আমরাও তাদের শহর নগর বন্দরে বোমা বর্ষণ করবো। তারা যদি আমাদের কাউকে অপহরণ করে আমরাও তাদের লোকদেরকে অপহরণ করবো, তারা আমাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে লুট করে নিলে আমরাও তাদের সম্পদ বৈধ কারণে যেভাবে সম্ভব ছিনিয়ে নেব।. ইমাম ইবনুল কাইয়েম রহঃ এ আয়াত সমূহের ব্যখ্যায় বলেন, এ সব আয়াত সমূহ প্রমাণ করে যে জান মাল, সহায় সম্পদ, ঘর বাড়ি নারী শিশু যাবতীয় ক্ষেত্রে সমান প্রতিশোধ গ্রহণ বৈধ। সমান প্রতিশোধ গ্রহণের বৈধতা ইসলামী শরিয়তে এমনই স্বীকৃত একটি বিধান যে স্বয়ং মুসলমানদের নিজেদের মধ্যেও এ কিসাস তথা হত্যার বদলে হত্যা বা সমান প্রতিশোধ গ্রহণ বৈধ; অতএব যে অপরাধের কারণে যে শাস্তি মুসলমানদের উপর প্রয়োগ বৈধ সে বিধান কুফফারদের ক্ষেত্রে তো সন্দেহাতীত ভাবে কার্যকর। অতএব আমেরিকা ও তার দোসররা যেহেতু গোটা পৃথিবী জুড়ে মুসলমানদের উপর

হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, অবরোধ আরোপ করে ইরাকে নারী শিশু সহ দশ লক্ষাধিক মানুষ হত্যা করেছে এবং এখনো করছে, আফগানিস্তানে আবাল বৃদ্ধ বণিতা নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে এবং এখনো করে চলছে; ইয়েমেন, সোমালিয়া ও পাকিস্তানে চলছে তাদের গোপন ড্রোন আক্রমন সেহেতু তাদের যে কোন নাগরিককে একই ভাবে পৃথিবীর যে কোন স্থানে যে কোন উপায়ে হত্যা করা, তাদের দেশে বোমা হামলা চালানো, তাদের নারী শিশুদেরকে হত্যা করা, তাদেরকে অপহরণ করা, তাদের টাকা পয়সা ধন সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া ও তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করা সম্পূর্ণ বৈধ।

৩য় দলীলঃ কা'ব বিন আশরাফের হত্যাকাণ্ড: -

এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিলো ৩য় হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসের ১৪ তারিখ রাতে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ছোট্ট একটি দলকে প্রেরণ করেন, তিনি তাদেরকে বিদায় জানানোর সময় বলেন, 'আল্লাহর নামে তোমরা বেরিয়ে পড়ো, হে আল্লাহ তুমি তাদেরকে সাহায্য করো' এর পর তিনি ঘরে এসে সালাত আদায় করতে থাকেন এবং তাদের সফলতার জন্য আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে মোনাজাত করতে থাকেন।

জাবির রাঃ থেকে বর্ণীত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক দিন বলেন, من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله 'কা'ব বিন আশরাফকে হত্যার জন্য কে আছো? সে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসুলকে কষ্ট দিয়েছে'। আল্লাহর রসূলের একথা শুনে মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহরাঃ বলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ আপনি কি সত্যিই চান আমি তাকে হত্যা করে ফেলি? তিনি বলেন, হ্যা আমি তাই চাই। মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহরাঃ বলেন, তাহলে আমাকে কিছু (মিথ্যা কথা) বলার অনুমতি দিন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমার যা প্রয়োজন বলো। অতঃপর মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ রাঃ কা'ব বিন আশরাফের কাছে এসে আল্লাহর রসূলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন এ ব্যক্তি আমাদের কাছে শুধু সাদাকা চায়, সে তো আমাদেরকে মহা কষ্টে ফেলে দিয়েছে! তখন সে বলে যে, এখন পর্যন্ত আর কিইবা দেখেছো, সে তো তোমাদেরকে শেষ

করে ছাড়বে। মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ রাঃ তখন বলেন, একবার যেহেতু তাঁর অনুসারীর খাতায় নাম লিখিয়েছি এখন আর তাঁর শেষ না দেখে ছাড়ছি না। যাই হোক শোনো, আমরা তোমার কাছে এসেছিলাম (এই বিপদের সময়) তুমি আমাদেরকে এক দুইসা' ধার দেবে এই জন্য। সে বললো, আচ্ছা তা দেয়া যাবে তবে তার বিনিময়ে আমার কাছে কিছু বন্ধক রাখতে হবে। মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ রাঃ বললেন আচ্ছা তুমিই বলো তুমি কী বন্ধক চাও; সে (নরপিচাশ) বললো, তোমাদের নারীদেরকে আমার কাছে বন্ধক রাখো। (রাগ ক্ষোভ সব চেপে রেখে স্বাভাবিক থাকার ভান করে তার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে) তিনি বললেন, আমরা কিভাবে আমাদের নারীদেরকে তোমার কাছে বন্ধক রাখি অথচ তুমি হচ্ছো আরবের সবচেয়ে সুদর্শন সুপুরুষ! তারপর সে বললো, তাহলে তোমাদের সন্তানদেরকে বন্ধক রাখো; তিনি বললেন, কিভাবে আমরা আমাদের সন্তারদেরকে বন্ধক রাখি বলো, তাহলে তো লোকেরা গালাগালি দিয়ে তাদেরকে বলবে যে, এই তোদেরকেই তো মাত্র এক দু' সা' এর বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছিলো! তার চেয়ে বরং আমরা আমাদের অস্ত্রশস্ত্র তোমার কাছে বন্ধক রাখি। অবশেষে সে সম্মত হয়। তারা রাতে গোপনে তার সাথে দেখা করার কথা বলে চলে যান।

রাতের বেলা মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ রাঃ কা'ব বিন আশরাফের দুধ ভাই আবু নায়লাকে সাথে নিয়ে আসলেন। তারা দু'জন তাকে ডাক দিলে সে যখন নেমে আসতে যাচ্ছিলো তখন তার স্ত্রী তাকে বললো, 'এতো রাতে কোথায় যাচ্ছো? আমার কাছে মনে হচ্ছে যেন তার কথা থেকে রক্তের ফোঁটা ঝড়ে পড়ছে'। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে সে বলেছে, 'আমার কাছে মনে হচ্ছে যেন তার মুখের আওয়াজের সাথে রক্ত বেরিয়ে আসছে'। সে বললো, আরে! এতো আমার বন্ধু মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ ও আমার দুধভাই আবু নায়লা এসেছে, ওদের সাথে একটু কথা বলতে যাচ্ছি। মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ রাঃ আবু নায়লা ছাড়াও আরও দু'জনকে সাথে নিয়ে এসেছিলেন, তারা হলেন আবু আবস বিন হাবর ও উব্বাদ বিন বিশার রাঃ। তিনি তাদেরকে আগে থেকেই বলে রেখেছিলেন যে, তিনি তার ঘাড় ধরে যখন তার মাথা নুইয়ে দেবেন তখন যেন তারা তাদের কাজ সেরে ফেলে। অতঃপর সে যখন নেমে এলো তারা বললো বাহ! তোমার শরীর থেকে তো চমৎকার সুঘ্রান আসছে! সে বললো, হ্যা তা তো হতেই পারে কারণ আমার কাছে রয়েছে আরবের সবচেয়ে সুগন্ধিনি নারী। মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ রাঃ বললেন

আমি কি একটু তোমার চুল থেকে ঘ্রান শুঁকে দেখতে পারি? সে বললো, অবশ্যই, এই নাও শুঁকে দেখো; সে কবার শুঁকে ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষন পর আবার বললো, (ওহ যা ঘ্রান!) আমাকে তোমার মাথাটা আরেকবার শুঁকতে অনুমতি দেবে? এবার সে তার মাথার চুলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মাথাটা নিচু করে ধরে অন্যদের বললো, এবার তোমাদের কাজ সেরে ফেলো, আর তারা সাথে সাথে তাকে হত্যা করে ফেলে। (সঃ)হীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

কা'ব বিন আশরাফ নিহত হওয়ার পর তার জাতির ইহুদীরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, আমাদের একজন অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে আপনার অনুসারীদের দ্বারা গুপ্ত হত্যার শিকার হয়েছেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেন, তার মতো একই রকম চিন্তার যেসব লোকেরা পালিয়ে গেছে তাদের মতো সেও যদি পালিয়ে যেত তাহলে তার এই দশা হতো না, কিন্তু সে আমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, আমাদেরকে অপমান করেছে; আর ভবিষ্যতেও কেউ যদি এমন দুঃসাহস দেখায় তাহলে সেও তার ঘাড়ের উপর তলোয়ার ছাড়াকিছু দেখতে পাবে না। (সঃ)হীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ওসীরাতে ইবনে হিশাম)

ফতহুল বারী গ্রন্থে ইবনে হাজার রহঃ ইকরামা রাঃ এর সুত্রে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন, এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর গোটা ইহুদী সম্প্রদায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের কাছে এসে তাদের নেতার গুপ্তহত্যার শিকার হওয়ার ঘটনা তাকে জানায়। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রক্তপণের ব্যপারে কোন কথা না বলে বরং তাদেরকে তিনি মনে করিয়ে দিতে লাগলেন যে সে আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসুল ও ঈমানদারদের সম্পর্কে কি সব আপত্তিকর কথাবার্তা বলে বেড়াতো। এত টুকুতেই তিনি ক্ষান্ত হননি, বরং তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে ভবিষ্যতেও যদি কেউ তার মতো আচরণ করে তাহলে তার পরিণতিও একই রকম হবে। হাফেজ ইবনে হাজার রহঃ বলেন কাউকে দাওয়াহ না দিয়ে হত্যার বৈধতার ব্যপারে এ ঘটনা একটি মজবুত দলীল।

কা'ব বিন আশরাফের কুকীর্তির মধ্যে অন্যতম ছিল সে মুশরিকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্ররোচনা দিতো, আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

সম্পর্কে আপত্তিকর কথাবার্তা বলতো এবং মুসলিম নারীদের সম্পর্কে অশ্লীল কবিতা রচনা করতো ইত্যাদি।

হাফেজ ইবনে হাজার রহঃ এ প্রসঙ্গে আরও বলেন,

وفيه جوازقتل المشرك بغيردعوة إذاكانت الدعوةالعامة قد بلغت ه এ ঘটনার মধ্যে সাধারন ভাবে ইসলামের দাওয়াত সবার কাছে পৌঁছে গেলে যে কোন মুশরিককে ব্যক্তিগত ভাবে ইসলামের দাওয়াত না দিয়ে হত্যা করার বৈধতা রয়েছে। ইমাম বুখারী রহঃ এ হাদিসটিকে জিহাদ অধ্যায়ে 'যুদ্ধে মিথ্যা বলা' অনুচ্ছেদে সংকলণ করেছেন। ইমাম নববী রহঃ এ হাদিসের ব্যখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, "কা'ব বিন আশরাফই প্রথম ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে নিরাপত্তা চুক্তি লংঘন করেছে, আর মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রাঃ ও তাকে প্রথমে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে তারপর তাকে হত্যা করেছেন বিষয়টি এমন নয়। কাযী আইয়ায রহঃ সহীহ মুলিমের শরাহ গ্রন্থ আল মিনহাজের মধ্যে বলেন, 'কারো জন্য একথা বলা বৈধ নয় যে কা'ব বিন আশরাফের হত্যাকাণ্ড কোন বিশ্বাসঘাতকতা ছিল'; আলী ইবনে আবী ত্বালিব রাঃ এর মজলিসে কোন এক ব্যক্তি এমন মন্তব্য করলে তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন"।

অতএব আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে যুদ্ধে লিপ্ত কোন কাফিরকে গুপ্ত হত্যা করাকে যদি কোন ব্যাক্তি গাদ্দারি বা বিশ্বাসঘাতকতা বলে আখ্যায়িত করে কিংবা বলে যে এভাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা ইসলামে হারাম তাহলে সে ব্যক্তি নির্ঘাত আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী পথভ্রষ্ট।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ 'আস সরিমুল মাসলুল' গ্রন্থে এ হাদিসের উপর আলোচনা পেশ করে বলেন 'আল আযা' শব্দটি প্রয়োগ হয় এমন লঘু শ্রেনীর দুষ্কৃতি বুঝানোর জন্য যার দ্বারা মানুষের অন্তরে কষ্ট দেয়া হয় পক্ষান্তরে 'যারার' শব্দটি ব্যবহার হয় সক্রিয় ভাবে চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কাউকে (মানসিক শারীরিক, সামাজিক অর্থনৈতিক ভাবে) প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার ক্ষেত্রে। তাই নিছক 'আযা' এর কারণেই যেখানে নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করা আবশ্যক হয়ে যায় সেখানে কেউ যদি আল্লাহ তায়ালা কিংবা তাঁর রসুলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গালি গালাজ করে, দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করেতা হলে তার হুকুম কী হতে পারে তা সকলেরই জানা। আর একটি বিষয় হলো এ ঘটনা প্রমাণ করে যে আল্লাহতায়ালা এবং তাঁর রসুলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কষ্ট দিবে তাকে হত্যা করা যে কোন মুসলমানের জন্য হালাল। এ ঘটনা আরও প্রমাণ করে যে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসুলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি কেউ কষ্ট দেয়, তাদের প্রতি অপমানজনক বা অশোভনীয় কোন কাজ যদি কেউ করে তাহলে তার সাথে মুসলমানদের সম্পাদিত সকল শান্তি চুক্তি স্বয়ংক্রিয় ভাবে বাতিল হয়ে যায়।

৪র্থ দলীলঃ ইবনে আবুল হুকায়েক আবু রাফে'র হত্যাকাণ্ড:-

আবু রাফে' ছিলো খায়বার অঞ্চলে বসবাসকারী একজন ইহুদী নেতা, হিজাযের বিখ্যাত ব্যবসায়ী। এই ব্যক্তি ছিলো সেসব লোকদের অন্যতম যারা মক্কার মুশরিদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উস্কানি দিতো। সে খন্দক যুদ্ধে মক্কার মুশরিকদেরকে উস্কানি দাতাদের অন্যতম হোতা। ৫ম হিজরী সনের যুলকা'দাহ কিংবা যুলহজ্জ মাসেতাকে হত্যা করা হয়।

এ ঘটনার সুত্রপাত হিসেবে ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক ইমাম যুহরী, আব্দুল্লাহ ও কা'ব বিন মালেক রাঃ এর সুত্রে বর্ণনা করেন যে, আওস এবং খাযরাজ গোত্রের লোকেরা একে অপরের সাথে ইসলামের জন্য যুদ্ধে কোন গোত্র কেমন ভুমিকা পালন করেছে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা করতো। অন্যান্য দিক থেকে উভয় গোত্র প্রায় সমান সমান থাকলেও আওস গোত্র দ্বারা সংগঠিত কা'ব বিন আশরাফের হত্যাকাণ্ডের মতো কোন উদাহরণ খাযরাজ গোত্রের লোকেরা উপস্থাপন করতে পারলো না। তখন তারা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললো, ইয়া রসুলাল্লাহ, আপনি আমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির নাম বলে দিন যাকে হত্যা করে আমরা আওস কর্তৃক কা'ব বিন আশরাফকে হত্যার কৃতিত্বের সমতা রক্ষা করতে পারি। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদেরকে আবু রাফে'কে হত্যার নির্দেশ দেন।

এই অভিযানে পাঁচজন সাহাবীর একটি জামাহ অংশ নেয়। তারা হলেন (১) আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক (২) মাসউদ বিন সিনান (৩)আব্দুল্লাহ বিন উনায়স (৪) আবু কাতাদা বিন হারিস (৫) খুযা'য়ী বিন আল আসওয়াদ রাঃ।

সহীহ আল বুখারিতে বারা বিন আযিব রাঃ এর সুত্রে বর্ণীত রয়েছে যে তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের একটি দলকে ইহুদী আবু রাফে'কে হত্যার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তাদের মধ্য থেকে একজন (আবু আতীক রাঃ) এগিয়ে গিয়ে ইহুদীদের দুর্গে প্রবেশ করেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি গিয়ে তাদের পশুর আস্তাবলে প্রবেশ করলাম আর তারা দুর্গের প্রধান ফটক বন্ধ করে দিল। এদিকে তাদের একজনের একটি গাধা হারিয়ে গিয়েছিলো; তারা গাধাটি খুঁজতে বেরিয়ে পড়লে আমিও গাধা খোঁজার ভান ধরে তাদের সাথে বেরিয়ে পড়লাম। আমি তাদেরকে বুঝাতে চাচ্ছিলাম যে আমিও তাদের সাথে গাধা খোঁজ করছি। অবশেষে গাধাটি পেয়ে গেলে তারা যখন দুর্গে প্রবেশ করে তখন আমিও তাদের সাথে আবার দুর্গে প্রবেশ করি। তারপর আমি লক্ষ করলাম যে তারা দুর্গের ফটক বন্ধ করে চাবিটি একটি কুলুঙ্গির মধ্যে রেখে দিলো।অতঃপর তারা ঘুমিয়ে পড়লে আমি চাবি নিয়ে ফটক খুলে রেখে (অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে) আবু রাফে'র ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম।

আমি 'ও আবু রাফে' বলে ডাক দিলে সে আমার ডাকে সাড়া দিলো। আমি তার আওয়াজ দ্বারা তার অবস্থান অনুমান করে তরবারির আঘাত হানলাম, আর অমনি সে চিৎকার করে উঠলো; আর আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। যেন তার সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে এসেছে এমন ভান করে আমি আবার ঘরে প্রবেশ করে গলার স্বর পরিবর্তন করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ও আবু রাফে' (চিৎকার করলে কেন) তোমার কী হয়েছে? সে বলল, তোমার মা ধ্বংস হোক (তাড়াতাড়ি আসছো না কেন) কি হল তোমার, কে যেন আমার ঘরে ঢুকে আমাকে আঘাত করেছে। তিনি (আবু আতীক) বলেন, অতঃপর আমি আমার তরবারি তার পেটের উপর রেখে শরীরের সকল শক্তি দিয়ে এমন জোরে চেপে ধরলাম যে তার (মেরুদণ্ডের) হাড্ডি পর্যন্ত গিয়ে ঠেকার শব্দ হল। (এরপর তার চিৎকারে ও বাচ্চাদের কান্নাকাটির শব্দে অন্যরাও জেগে উঠে দরজা খুলতে লাগলো) অতঃপর আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে গিয়ে পড়ে গেলাম এবং এতে আমার পায়ে প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। যাই হোক কোন মতে আমি বেরিয়ে এসে আমার সঙ্গীদের সাথে মিলিত হলাম। আমি তাদেরকে বললাম, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি (আবু রাফে'র) মৃত্যু সংবাদ প্রচারকারিণীর ঘোষণা শুনতে না পাই ততক্ষন পর্যন্ত আমি এ স্থান ত্যাগ করবো না। সত্যিই হিজাযের বিখ্যাত ব্যবসায়ী আবু রাফে'র মৃত্যু সংবাদ না শুনে আমি সে স্থান

ত্যাগ করলাম না। মৃত্যু সংবাদ যখন আমি শুনলাম তখন আমি দাড়িয়ে গেলাম এবং আমার যেন কোন ব্যথাই ছিলো না। অবশেষে আমি আল্লাহর রসূলের কাছে গিয়ে আবু রাফে'কে হত্যার খবর দিলাম। (বুখারী হাদিস নং-৩০২২, ৩০২৩, ৪০৩৮-৪০৪০; আধুনিক প্রকাশনীর ছাপায় হাদিস নং-২৮০০ এবং ইসলামী ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ছাপায় হাদিস নং ২৮১০)

(বিভিন্ন হাদিস ও ইতিহাস গ্রন্থে এ ঘটনার আরও খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। আগ্রহী পাঠকগণ চাইলে তা পড়ে আরও বেশী উপকৃত হতে পারেন।)

এক বর্ণনায় রয়েছে যে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসার পর তিনি তার পায়ের ব্যথার স্থানে তাঁর মুবারক মুখের থুথু লাগিয়ে দেন এবং আবুল আতিক রাঃ বলতেন এরপর তিনি কখনো সেখানে কোন ব্যথা অনুভব করেননি। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় অবশ্য রয়েছে যে তারা পাঁচজনই দুর্গে প্রবেশ করেছিলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়স রাঃ তার উপর তরবারির আঘাত হানেন; আব্দুল্লাহ বিন আতিক রাঃ এর পা ভেঙ্গে যায় এবং তারা তাকে ধরাধরি করে বের করে নিয়ে আসেন ইত্যাদি।

হাফেজ ইবনে হাজার রহঃ এই হাদিসের ব্যখ্যায় ফতহুল বারী গ্রন্থে বলেন, ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গিয়েছে এমন মুশরিকদেরকে হত্যার বৈধতা সহ আল্লাহর রসূলের (আনীত দ্বীনের) বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে শক্তি সম্পদ কিংবা জবান দ্বারা কেউ যদি তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে তাহলে তাদেরকে যে কোন উপায়ে হত্যা করা এবং যুদ্ধরত কাফিরদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির ব্যপারে এ ঘটনা থেকে বৈধতা পাওয়া যায়।

৫ম দলীলঃ খালিদ বিন সুফিয়ান আল হুযায়লীর হত্যাকাণ্ড:-

খালিদ বিন সুফিয়ান ছিল বনু হুযায়ল গোত্রের লোক। সে আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মদীনা আক্রমনের উদ্দেশ্যে বিশাল এক সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেছিল। ইমাম আহমাদ রহঃ তার মুসনাদে এবং অন্যন্য অনেক হাদিস সংকলকগন আব্দুল্লাহ বিন উনায়স রাঃ থেকে এ ঘটনার বর্ণনা সংকলন করেছেন। তিনি বলেন,

دعاني رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: إنه قد بلغني أن خالدبن سفيان الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني فائ ته فاقتله

একদিন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডেকে বলেন 'আমার কাছে এই সংবাদ এসেছে যে খালিদ বিন সুফিয়ান আল হুযায়লী আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লোকজন জড় করছে, অতএব তুমি গিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলো'।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَن لسفيان الهذلي يهجوني ويشتمني ويؤذيني

'সুফিয়ান আল হুযায়লীকে শায়েস্তা করার মতো কে আছো? সে আমাকে অপমান করছে, কষ্ট দিচ্ছে!'

আব্দুল্লাহ বিন উনায়স রাঃ বলেন, আমি আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আপনি আমার কাছে তার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন যাতে আমি তাকে চিনতে পারি। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তার চেহারার দিকে তাকালেই তোমার মধ্যে একটা ঘৃণা ও বিরক্তির উদ্রেক হবে। এরপর আমি প্রস্তুতি নিয়ে রওয়ানা হয়ে পড়লাম, আমি যখন তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম তখন ঠিক তেমনই পরিস্থিতির মুখোমুখি হলাম যেমনটি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছিলেন। তাকে দেখলাম সে অস্থিরতার সাথে কাঁপছে আর পায়চারী করছে। সেখানে দেখলাম কিছু পতিতাদের আনাগোনা রয়েছে যারা তার কাছে আসা যাওয়া করতো। আমাকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করলো তুমি কে? আমি বললাম, আমি আপনার কথা শুনে এবং আপনার বাহিনী প্রস্তুত করার খবর শুনে যোগ দিতে এসেছি। আমি তার সাথে কিছু সময় হাঁটাহাঁটি করলাম, এরপর (এক নির্জন গলি পথে এসে) সে যেই আমাকে সুযোগ করে দিলো আমি অমনি তার উপর তলোয়ার নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লাম এবং হত্যার পর রাস্তার ইঁটা বালু পাথর ইত্যাদি দিয়ে তাকে ঢেকে ফেললাম। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে তিনি বলেন 'অতঃপর রাত গভীর হয়ে পড়লে লোকেরা যখন ঘুমিয়ে পড়লো তখন আমি চুপচাপ তাকে হত্যা করে তার মাথা কেটে নিয়ে এলাম। তারপর যখন তার কাটা মাথা নিয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলাম তখন তিনি

আমাকে দেখেই বললেন, – أفلح الوجه। অর্থাৎ তোমার চেহারা সফলতায় উদ্ভাসিত হয়েছে; আমি বললাম ইয়া রসুলাল্লাহ আমি আল্লাহর ইচ্ছায় তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি। তিনি বললেন, তুমি সত্য বলেছো। তারপর তিনি আমাকে নিয়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করে আমাকে একটি লাঠি উপহার দিয়ে বললেন, হে আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়স, এই লাঠিটি কেয়ামতের দিন আমার ও তোমার মাঝে (সঃ)ম্পর্কের) নিদর্শন স্বরূপ তোমার কাছে রেখে দাও। – إن أقل الناس المتخصرون يومئذٍ খুব কম মানুষই সেদিন এমন লাঠির অধিকারী হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আব্দুল্লাহ রাঃ সেই লাঠিটিকে তার তলোয়ারের সাথে লাগিয়ে রেখেছিলেন, তিনি সেটিকে সব সময় সাথে সাথে রাখতেন এমনকি মৃত্যুর সময় তিনি এটি তার সাথে দিয়ে দিতে নির্দেশ দেন; আর এভাবে সে লাঠিটি তার কাফনের মধ্যে দিয়ে তাকে দাফন করা হয়।

ষষ্ঠ দলীলঃ ইহুদী নারীর হত্যাকাণ্ড:-

ইমাম শা'বী রহঃ হযরত আলি রাঃ এর সুত্রে বর্ণনা করেন, এক ইহুদী মহিলা ছিল যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি গালাজ করতো এবং তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন রকম আপত্তিকর মন্তব্য করতো। অতঃপর এক ব্যক্তি তার শ্বাসনালী চেপে ধরে তার নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকে মেরে ফেলে। এ ঘটনা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলে তিনি সে মহিলার কোন রক্তমুল্য পরিশোধের নির্দেশ দেননি। ইমাম আবু দাউদ রহঃ ও অন্যান্য সংকলকগণ এঘটনা বর্ণনা করেছেন। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ বলেন এ হাদিসটি উত্তম, কারণ ইমাম শা'বী রহঃ আলী রাঃ কে দেখেছেন এবং তার থেকে তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া এ বর্ণনা যদি মুরসাল শ্রেণীরও হয়ে থাকে তবে ইমাম শা'বী রহঃ জ্ঞানীদের কাছে সহীহ মুরসাল বর্ণনাকারী হিসেবেই পরিচিত। তার থেকে যতো মুরসাল বর্ণনা রয়েছেতা সবই সহীহ, আর তিনি আলী রাঃ বর্ণীত হাদিসের ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞানী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাছাড়া এই হাদিসের অন্যান্য বর্ণনাকারীগণও নির্ভরযোগ্য এবং এর সমর্থনে ইবনে আব্বাস রাঃ এর বর্ণনাও রয়েছে। অতএব এ হাদিসটি হয় খবরে ওয়াহেদ অথবা এর অর্থের দিক থেকে অন্তত ওয়াহেদ শ্রেণীর; আহলে ইলমগন এ হাদিস এবং এমন অন্যান্য যেসব

ঘটনা সাহাবীদের থেকে বর্ণীত রয়েছে তা থেকে দলীল গ্রহণে মোটেই ইতস্ততঃ করেননি।

এ ঘটনা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, নারী হোক কিংবা পুরুষ, যিম্মী হোক বা চুক্তিবদ্ধ, এমনকি যদি মুসলিম নামধারীও হয় তবুও আল্লাহর রসূলের শানে অসম্মান জনক কথা বললে তাকে হত্যা করা সম্পূর্ণ বৈধ। কারণ এ ঘটনায় অপরাধী হল একজন মহিলা এবং সে মদীনার চুক্তিবদ্ধ ইহুদী সম্প্রদায়ের লোক ছিল।

সপ্তম দলীলঃ মুশরিকদের গুপ্তচরকে হত্যার ঘটনা

সালামা ইবনু আকওয়া রাঃ বর্ণনা করেন একবার রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক সফরের সময় তাঁর কাছে মুশরিকদের পাঠানো একজন গুপ্তচর আসলো। সে এসে তাঁর সাহাবীদের সাথে বসে বেশ কিছুক্ষন কথাবার্তা বলে চলে গেলো। এরপর (যখন তিনি জানতে পারলেন যে সে গুপ্তচর ছিলো তখন) তিনি বললেন اطلبوه و اقتلوه। তাকে খুঁজে বের করে এনে হত্যা করে ফেলো। তারপর (কোন এক সাহাবী) তাকে খুঁজে বের করে হত্যা করে ফেলে; রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহতের কাছে থাকা মালামাল হত্যাকারীকে প্রদান করেন। (সঃ)হীহ আল বুখারী হাদিসনং ৩০৫১, সহীহ মুসলিম হাদিস নং - ১৭৫৩, আধুনিক প্রকাশনীর ছাপায় বুখারির হদিস নং- ২৮২৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ছাপায় বুখারির হাদিস নং- ২৮৩৩; মুসনাদে আহমাদ হাদিস নং- ১৬৫২৩)

অষ্টম দলীলঃ আসমা বিনতে মারওয়ানের হত্যাকাণ্ড:-

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ তার'আস স-রিমুল মাসলুল আ'লা শাতিমির রসুল' নামক গ্রন্থে এবং ইমাম মাকরিযী রহঃ'ইমতাউল ইসমা' নামক গ্রন্থে এ ঘটনাটি সংকলন করেছেন।

ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন, খুতামা গোত্রের এক মহিলা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের শানে অপমান জনক কথাবার্তা বলতো; রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক দিন বলেন, আমার পক্ষ থেকে তাকে শায়েস্তা করার কে আছো? সেই মহিলার গোত্রের এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বলল, আমি আছি ইয়া রসুলাল্লাহ। অতঃপর সে তাকে হত্যা করে এসে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে খবর দেয়। তিনি খবর শুনে (তার রক্তপন প্রসঙ্গে) তিনি বলেন দু'টো রাম ছাগলও তার (রক্তপণের) ব্যাপারে বাদানুবাদ করতে পারে না। (অর্থাৎ তার রক্তপন পরিশোধের কোন প্রশ্নই ওঠে না) আসহাবুল মাগাযী বা যুদ্ধের ঘটনা সংকলকগনের অনেকেই আরও বিস্তারিতভাবে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইমাম ওয়াকেদী রহঃ বলেন, আব্দুল্লাহ বিন হারিস ফুযায়ল থেকে তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করে যে আসমা বিনতে মারওয়ান ছিল ইয়াযিদ বিন হিসান আল খত্তামির অধিনস্ত। সে আল্লাহর রসুলকে কষ্ট দিতো এবং ইসলামের সমালোচনা করত এবং এ উদ্দেশ্যে সে কবিতা রচনা করতো। উমায়র বিন আদি আল খত্তামী রাঃ এই দুষ্ট মহিলার কথাবার্তা শুনে বলেন, হে আল্লাহ আমি তোমার নামে একটি মান্নত করছি, আমি যদি মদিনায় ফিরতে পারি তাহলে আল্লাহর রসূলের তরফ থেকে আমি তাকে হত্যা করবো। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর থেকে ফিরে আসার পর এক রাতে উমায়র বেরিয়ে পড়েন তার মিশন সফল করতে। তিনি গভীর রাতে এসে তার ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি অন্ধকারে হাতড়ে তাকে বের করে বুঝতে পারেন পান যে সে তার এক বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। তিনি বাচ্চটিকে আস্তে করে ছাড়িয়ে নিয়ে তার পেটের মধ্যে তলোয়ার ঢুকিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেন। মিশন শেষ করে এসে তিনি আল্লাহর রসূলের সাথে ফজর সালাত আদায় করেন।অতঃপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমায়রের দিকে তাকিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি আসমা বিনতে মারওয়ানকে হত্যা করে ফেলেছ? তিনি বললেন, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক ইয়া রসুলাল্লাহ, হ্যা আমি তাকে হত্যা করেছি।

উমায়র রাঃ ভয় পাচ্ছিলেন যে সে মহিলাকে হত্যার কারণে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আবার কোন ঝামেলা এসে পড়ে কি না; তাই সংশয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসুলাল্লাহ এ কারণে কি আমার উপর (রক্তমুল্য পরিশোধের) কোন দায় ভার বর্তাবে? তিনি বলেন তার (রক্তমুল্যের) ব্যাপারে দুটো রাম ছাগলও বাদানুবাদ করতে পারে না। অতঃপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আশপাশে যারা ছিল তাদেরকে লক্ষ করে বললেন, তোমাদের যখন মন চাইবে এমন কোন ব্যক্তির দিকে তাকাতে যে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসুলকে সাহায্য করেছে তখন তোমরা উমায়র বিন আদি এর দিকে তাকাবে। ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ তখন বলেন, তোমরা এই অন্ধ ব্যক্তির

দিকে তাকিয়ে দেখ যে আল্লাহর আনুগত্যে ঝাপিয়ে পড়েছে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথা শুনে বলেন-

لاتقل الأعمى ولكنه البصير তাকে অন্ধ বল না সে তো চক্ষুষ্মান। উমায়ের রাঃ যখন আল্লাহর রসূলের কাছ থেকে বেরিয়ে এসে তার নিজ গোত্রের এলাকায় আসলেন তখন লোকেরা সেই মহিলার দাফন কাফনে ব্যস্ত ছিলো। তারা তাকে মদিনার দিক থেকে আসতে দেখে সন্দেহ করলো; তাকে জিজ্ঞাসা করলো, উমায়র! তুমিই কি এই মহিলাকে হত্যা করেছ? তিনি বললেন, হ্যা আমিই হত্যা করেছি, فكيدوني جميعا ثم لاتنظرون অতএব তোমরা সবাই মিলে আমাকে শায়েস্তা করার যে কোন ফন্দি আঁটতে পারো, আর আমাকে (তা প্রতিরোধের) কোন অবকাশই দিও না। যার হাতে আমার প্রান আমি সেই সত্ত্বার কসম করে বলছি, তোমরা সকলেও যদি তার মতো একই কথা বলতে তাহলে আমি একা তোমাদের সবার উপর তলোয়ার নিয়ে ঝাপিয়ে পড়তাম; হয় আমি নিহত হতাম অথবা তোমাদেরকে হত্যা করে ফেলতাম। তার এই সাহসী পদক্ষেপের ফলে আল্লাহর ইচ্ছায় সেই দিনই বনী খুতামার উপর ইসলাম বিজয়লাভ করে। এই গোত্রের মধ্যে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও এতো দিন গোত্রের লোকদের ভয়ে তা গোপন করে রাখতেন; এই ঘটনার পর তারাও প্রকাশ্যে তাদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। কবি হাসসান বিন সাবিত উমায়র বিন আদির প্রশংসা করে কবিতাও রচনা করেছেন। এ ঘটনাটি মুহাম্মাদ বিন সা'দ তার তাবাকাতের মধ্যেও সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ বলেন, সাহাবায়ে কেরাম রাঃ দের মাঝে এটা একটা সাধারণ প্রচলন ছিল যে, আল্লাহর রসুলকে কেউ কষ্ট দিয়েছে একথা তারা জানতে পারলে তারা তাকে নির্দ্বিধায় হত্যা করে ফেলতেন, কেননা তার এ অপরাধের শাস্তি হিসেবে এটাই তার প্রাপ্য। কেবল আল্লাহর রসূলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা সাপেক্ষে তিনি যদি কাউকে ক্ষমা করে দিতেন তবেই কেউ হত্যার হাত থেকে বাঁচতে পারতো। তবে এ ধরণের অপরাধী কোন ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রার্থনার আগেই যদি কেউ হত্যা করে ফেলত তাহলে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হত্যাকারীকে কোন দোষারোপ করতে না, বরং তাকে বাহবা দিতেন এবং তার প্রশংসা করতেন; কেননা সে তো আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসুলকে সাহায্য করেছে। যেমন ওমর রাঃ এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলেন এ কারণে যে, সে আল্লাহর রসূলের বিচারে

সন্তুষ্ট হয়েছিলো না। আসমা বিনতে মারওয়ান ও অন্য এক ইহুদী নারীকে হত্যার দৃষ্টান্তও একই রকম।

আল্লাহর রসূলের ইন্তেকালের সাথে সাথে ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে আর বাকি রয়ে গেছে কেবল শাস্তি প্রয়োগের বিধান।

নবম দলীলঃ ইহুদী আবু আফাকের হত্যাকাণ্ড:-

সীরাত ও যুদ্ধের ঘটনা সংলকদের অনেকেই এ ঘটনা সংকলণ করেছেন। ইমাম ওয়াকেদী রহঃ বর্ণনা করেন যে বনু আমর গোত্রের এক অতিশয় বয়স্ক বৃদ্ধ ছিল যাকে আবু আফাক বলে ডাকা হতো; তার বয়স হয়ে গিয়েছিলো একশত বিশ বছর। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুউ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমন করলে সে ইসলামে তো প্রবেশ করেইনি বরং আদা জল খেয়ে তাঁর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বদর যুদ্ধের জন্য মদিনা থেকে বের হন তখন তাঁর হিংসার আগুন আরও জ্বলে ওঠে, সে যা খুশি তাই বলা আরম্ভ করে, সে আল্লাহর রসূলের শানে অপমানজনক কবিতা লিখে প্রচার করতে লাগে এবং তাঁর সাহাবীদের নামেও বিভিন্ন রকম কুৎসা রটনা আরম্ভ করে।

সালিম বিন উমায়র রাঃ তার এসব শুনে বলেন, আমি মানত করলাম যে হয় আমি তাকে হত্যা করবো অথবা আমি নিহত হব; মদিনায় ফিরে তিনি অপেক্ষায় থাকেন কখন সুযোগ পাওয়া যায়। অতঃপর এক দিন তিনি সেই মোক্ষম সুযোগটি পেয়ে গেলেন। এক গরমের রাতে আবু আফাক বাইরে শুয়ে ছিল। সালিম বিন উমায়র আস্তে করে তার কাছে গিয়ে শরীরের মাঝখান থেকে এমনভাবে তলোয়ার চালিয়ে দেন যে সে প্রায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। আল্লাহর শত্রু তারস্বরে চিৎকার আরম্ভ করে দেয়; সালিম বিন উমায়র চুপিসারে সরে পড়েন। তারপর তার আস পাশের লোকেরা এসে জড় হয়ে বলতে থাকে, আল্লাহর কসম আমরা যদি তার হত্যাকারীকে শনাক্ত করতে পারি তাহলে অবশ্যই তাকে হত্যা করবো।

ইমাম ওয়াকেদী রহঃ বলেন আবু আফাকের হত্যাকাণ্ড হিজরতের বিশ মাসের মাথায় শাওয়াল মাসে সংগঠিত হয়েছিলো। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ বলেন, ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছিলো কা'ব বিন আশরাফের ঘটনার পূর্বে; আর এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে চুক্তিবদ্ধ কোন জাতি গোষ্ঠীর লোকেরাও যদি আল্লাহ তায়ালা

কিংবা তাঁর রসূলের শানে অপমানজনক কিছু বলে তাহলে সে ব্যক্তির নিরাপত্তা রহিত হয়ে যায়।

দশম দলীলঃ আসওয়াদ আল আনসীর হত্যাকাণ্ড:-

আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, তাবাকাতে ইবনে সা'দ, সীরাতে ইবনে হিশাম, তারিখে তাবারী সহ ইসলামের ইতিহাসও আল্লাহর রসূলের যতো সীরাত গ্রন্থ রয়েছে তার প্রায় সকল গ্রন্থেই এ ঘটনা বিশুদ্ধ সনদে সংকলিত হয়েছে। বিভিন্ন সংকলকের বর্ণনার মধ্যে খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয়ে সামান্য তারতম্য থাকলেও সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপক কোন মত পার্থক্য নেই। আমরা এখানে সে সব বর্ণনাসমূহের সমন্বিত একটি ধারা বর্ণনা তুলে ধরবো।

বিদায় হজ্জের পর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ক্রমান্বয়ে অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকেন তখন বিভিন্ন দিকে ভণ্ডদের মিথ্যা নবুওত দাবীর ফেতনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এসব মিথ্যা নবুওত দাবীদারদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিল ইয়েমেনের আসওয়াদ আল আনসী। সে আগে থেকেই গণক শ্রেণীর লোক ছিল, সে যাদু বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিল। সে বেশ প্রভাবশালীও ছিল; মানুষকে বিমোহিত ও মন্ত্রমুগ্ধ করার এক বিশেষ দক্ষতা ছিল তার। এসব কারণে সে শুধু সমাজের সাধারণ মানুষের উপরই নয় বরং সমাজের উচুস্তর ও বিত্তশালী লোকদের উপরও সে বেশ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। সে নিজেকে এক রহস্যময় মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জনসমক্ষে বের হওয়ার সময় বিশেষ এক ধরণের মুখোশ পড়ে বের হতো।

আসওয়াদআল আনসীর হত্যাকাণ্ডে যিনি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখেন তিনি হলেন ফিরোজ আদ দায়লামী। ইয়েমেনে সে সময় যারা প্রভাবশালী ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল আবনা সম্প্রদায়ের লোকজন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিল পারস্যের সাসানী শাসক শ্রেণীর উত্তর পুরুষ যারা দীর্ঘ দিন ইয়েমেনকে শাসন করেছে এবং এদের মায়েরা ছিল স্থানীয় আরব। ফিরোজ আদ দায়লামি ছিলেন ইয়েমেনের এই আবনা সম্প্রদায়ের লোক। ইসলামের আবির্ভাবের সময় আবনাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল বাজান এবং সে–ই পারস্য সাম্রাজ্যেরপক্ষ থেকে এ অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতো। যখন সে ইসলামের সত্যতা তথা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের আসমানী দাওয়াতের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হল তখন পারস্য সাম্রাজ্য থেকে আনুগত্য প্রত্যাহার করে ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার অধিনস্ত লোকেরাও তাকে অনুসরণ করে ইসলাম গ্রহণ করে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামও তাকে শাসক হিসেবে বহাল রাখেন। কিন্তু আসওয়াদ আল আনসীর আবির্ভাবের কিছু দিন পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেন।

আসওয়াদ আল আনসীর গোত্র বনু মুদহিজ সর্বপ্রথম তার মিথ্যা নবুওতের দাবীর প্রতি সমর্থন জানায়। সে তার গোত্রীয় বাহিনী নিয়ে সান'য়া আক্রমন চালিয়ে এখানকার গভর্নর বাধানের পুত্র শাহারকে হত্যা করে এবং তার স্ত্রী দাদওয়াহকে সে জোরপূর্বক নিজে গ্রহণ করে। সান'য়া থেকে সে আস পাশের অঞ্চলে একের পর এক অভিযান চালাতে থাকে। তার এই অতর্কিতে আক্রমনের ফলে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে হাদরা মাওত থেকে তায়েফ ওআল আহসা থেকে এডেন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল তার দখলে চলে আসে।

আসওয়াদ আল আনসীর ফিতনা যখন প্রায় ব্যপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন তখন একটি চিঠি দিয়ে মু'য়ায বিন জাবাল রাঃ এর নেতৃত্বে দশ জন সাহাবীকে ইয়েমেনের বিশস্ত অনুসারীদের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি যে কোন মুল্যে আসওয়াদ আল আনসীর ফিতনা নির্মূল করার নির্দেশ দেন।

আল্লাহর রসূলের চিঠি পাওয়ার পর ফিরোজ আদ দায়লামী তার অন্যান্য সাথী সঙ্গীদেরকে নিয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য বৈঠকে বসেন। এ ব্যাপারে ফিরোজ আদ দায়লামী বলেন-

'আমরা আগে থেকেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম আসওয়াদ আল আনসীকে শায়েস্তা করার জন্য, কিন্তু বিষয়টি নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছিলাম না। এরপর আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি পাওয়ার পর আমাদের নৈতিক শক্তি বহু গুনে বৃদ্ধি পায় এবং আমাদের প্রত্যেকে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য। এদিকে আসওয়াদ আল আনসী তার একের পর এক সফলতার কারণে বেশ অহংকারী হয়ে পড়ে; ফলে সে তার সেনাপতিদের সাথে এমন খারাপ ব্যবহার করা আরম্ভ করে যে স্বয়ং তাদেরও মনে হচ্ছিলো যে, পান থেকে চুন খসলে তারাও যে কেউ যে কোন সময় তার আক্রোশের শিকার হয়ে যেতে

পারে। তার একজন সেনাপতি ছিল কায়েস বিন ইয়াগুস; আমি আমার চাচাত বোন দাদাহকে নিয়ে একদিন কায়েসের সাথে সাক্ষাত করে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠি সম্পর্কে তাকে অবহিত করলাম এবং তাকে বললাম যে, তার হাতে তুমি শায়েস্তা হওয়ার আগে বরং তুমি তাকে শায়েস্তা করে ফেলো। সে আমাদের প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দেয় এবং আমাদেরকে সে আসওয়াদ আল আনসীর বেশ কিছু গোপন তথ্য সরবরাহ করে। এরপর আমরা তিনজন পরিকল্পনা করলাম যে আমরা তাকে দুর্গের ভেতর থেকে আক্রমন করবো এবং আমাদের অন্য ভাইয়েরা বাহির থেকে থেকে আক্রমন করবে। আমরা আরও সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা আমাদের আত্মীয়া দাদওয়ায়হকেও আমাদের দলে ভেড়াবো, যার স্বামীকে হত্যা করে আসওয়াদ আল আনসীতাকে জোর পূর্বক নিজের স্ত্রী বানিয়ে নিয়েছিলো। আমরা আসওয়াদ আল আনসীর দুর্গে গিয়ে দাদওয়ায়হ এর সাথে সাক্ষাত করে তাকে বললাম, তুমি ভালো করেই টের পাচ্ছো যে এই ব্যক্তি তোমার জীবনকে কিভাবে দুর্বিষহ করে তুলেছে, সে তোমার স্বামীকে হত্যা করেছে, তোমার সম্প্রদায়ের নারী পুরুষ সবাইকে লাঞ্ছিত করেছে, তাদেরকে হত্যা করে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এই ফিতনাকে চিরতরে মিটিয়ে দেয়ার জন্য এই চিঠি পাঠিয়েছেন। তুমি কি এ ব্যপারে আমাদেরকে সহযোগিতা করবে?

সে বললো, আমি কিভাবে তোমাদেরকে সহযোগিতা করতে পারি? আমি তার ইতিবাচক মনোভাব বুঝতে পেরে সরাসরি বলে ফেললাম যে আমরা তাকে হত্যা করতে চাই। আমার কথা শুনে সে বললো, 'আল্লাহর কসম আমিও মনে মনে একই কথা ভাবছিলাম, সেই সত্ত্বার কসম যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমি তার অধীনে থাকলেও আমার মনে আমার ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে কখনো বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হয়নি, আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য তার চেয়ে নিকৃষ্ট কোন ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেননি; আল্লাহর কসম! আমি যখন থেকে তাকে দেখে আসছি তাকে কেবল মিথ্যাচারী, ভণ্ড, প্রতারক ও শয়তান রূপেই দেখে আসছি; তার থেকে আমি আজ পর্যন্ত ভালো কিছু দেখিনি'। আমি তাকে বললাম, এখন বলো কিভাবে আমরা তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে পারি। সে তো সব সময় নিরাপত্তা রক্ষীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। সে আমাদেরকে দুর্গের একটি পরিত্যক্ত রুমের

কথা বলে বললো, তোমরা রাতের প্রথম প্রহরে ওখান থেকে প্রবেশ করবে, ওখানে তোমাদের জন্য অস্ত্র ও আলোর ব্যবস্থা করা থাকবে, আর স্বয়ং আমিও সেখানে থাকবো। আমি বললাম, তুমি যা বলেছো মন্দ নয় তবে এভাবে প্রবেশ করতে গেলে আমরা নিরাপত্তা রক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে যেতে পারি, তুমি তার চেয়ে আমার কাছে তোমার একজন বিশ্বস্ত একজন কাজের লোককে পাঠাও, আমি তাকে বুঝিয়ে দেবো, দুর্গের কোন স্থানে ভেতর থেকে একটি প্রবেশপথ তৈরি করে রাখলে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা যাবে।

এরপর সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে আমরা একদিন রাতে আমাদের তৈরি করা নির্দিষ্ট স্থান দিয়ে প্রবেশ করলাম, পরিকল্পনা মাফিক সেখানে অস্ত্র ও আলো আগে থেকেই রাখা ছিল; আমরা আস্তে করে আল্লাহর শত্রুর রুমের দিকে অগ্রসর হলাম, আমার আত্মীয়াকে তার দরজায় দাঁড়ানো পেলাম, সে আমাদেরকে তার অবস্থান স্থল দেখিয়ে দিলো। আমরা তার ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম সে গভীর ঘুমে নাক ডাকছে। আমি তার গলায় তলোয়ার চালাতেই সে ষাঁড় জবাই করার সময় যেভাবে শব্দ করে সেভাবে গোঙ্গানি দিয়ে উঠলো। শব্দ শুনে রুমের অদুরে দাড়িয়ে থাকা নিরাপত্তা রক্ষীরা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলো, কী হয়েছে? কিসের শব্দ হল এটা? দাদওয়ায়হ তাদেরকে বলল, তোমরা তোমাদের কাজে যাও, আল্লাহর নবীর উপর ওয়াহী অবতীর্ণ হচ্ছে! একথা শুনে তারা চলে গেলো। আমরা সকাল অব্দি দুর্গের মধ্যেই অবস্থান করলাম। ফজরের সময় ঘনিয়ে এলে আমি একটি ওয়ালের উপর উঠে তিন বার তাকবীর দিলাম; তারপর আযান দেয়া আরম্ভ করলাম, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' (আমি স্বাক্ষ দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ আল্লাহর রসুল)বলে তার সাথে আমিযোগ করলাম 'ওয়া আশহাদু আন্না আসওয়াদ আল আনসী আল কাযযাব' (এবং আমি আরও স্বাক্ষ দিচ্ছি যে আসওয়াদ আল আনসী হল মহা মিথ্যাবাদী)।

এটাই ছিল আমাদের পূর্ব নির্ধারিত সংকেত যার দ্বারা আমাদের অন্য সাথীরা মিশন সফল হওয়ার সুসংবাদ পাবে। আমি এই ঘোষণা দেয়ার পর চারিদিক থেকে মুসলমানরা আল্লাহু আকবার তাকবীর ধ্বনি দিয়ে একযোগে আক্রমন করে। সকালের আলো ফুটে ওঠার আগেই তার দুর্গের পতন ঘটলো এবং আমাদের মিশন সফল হল এবং সাথে সাথে আমরা বিশেষ দুত মারফত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আল্লাহর শত্রুর সদলবলে নিহত হওয়ার সংবাদ

প্রেরণ করি। কিন্তু বার্তা বাহক মদিনায় পৌঁছে দেখতে পায় যে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই রাতেই ইন্তেকাল করেছেন। তবে অন্যান্য সাহাবীদের থেকে তারা জানতে পারেন যে যখন আমাদের অপারেশন সফল হয় তখনই তিনি এ সংবাদ ওয়াহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন'।

ইবনে ওমর রাঃ থেকে বর্ণীত আছে যে, যে রাতে আসওয়াদ আল আনসী নিহত হয় সে রাতেই আসমান থেকে ওয়াহির মাধ্যমে আল্লাহর রসূলের কাছে তার নিহত সংবাদ আসে। তিনি আমাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে বলেন, আসওয়াদ আল আনসী নিহত হয়েছে। এক মুবারক পরিবারের এক মুবারক ব্যক্তি তাকে হত্যা করেছে। জিজ্ঞাসা করা হল সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, ফিরোজ ফিরোজ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সত্যকে সত্য হিসেবে দেখিয়ে দাও এবং তা অনুসরণের তাওফিক দাও; আর মিথ্যাকে আমাদের মিথ্যা হিসেবে দেখিয়ে দাও এবং আমাদেরকে তা পরিহার করে চলার তাওফিক দাও। আমাদেরকে তোমার সেই সব বান্দাদের কাতারে শামিল করো যারা তোমার সন্তুষ্টির বিনিময়ে নিজেদের জীবনকে বিক্রি করে দিয়েছে। আমাদেরকে তুমি তোমার সেই সব বান্দাদের দলে শামিল করো যাদের জান মাল তুমি কবুল করে নিয়েছো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের অন্তর থেকে দুনিয়ার মুহাব্বাতকে দূর করে দাও, তুমি আমাদের অন্তরে জিহাদের এমন অনন্ত তামান্না তৈরি করে দাও যাতে আমরা আমাদের জান মাল তোমার রাস্তায় কোরবানী করার আগে কিছুতেই ক্ষান্ত না হই। হে আল্লাহ তুমি মুসলিম উম্মাহকে তোমার দ্বীনের দিকে উত্তম ভাবে ফিরিয়ে আনো। আমীন!!!

মুলঃ শায়েখ আবু জান্দাল আল আযদী (আবু সালমান ফারিস ইবনে আহমাদ আল শুআইল আয-যাহরানি)

(collected)

পোস্টের লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩৩০৯

কাফিরদের রক্ত হালাল হওয়ার দলিল-Murabit ভাই

Alif

Member

০৭-১৮-২০১৬

কাফিরের রক্ত হালাল হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহাদের মতঃ

قال الكاساني: (والأصل فيه: أن كل من كان من أهل القتال: يحلّ قتله سواء قاتل أو لم يقاتل). [بدائع الصنائع 7/101]

কাছানি বলেন এই ক্ষেত্রে মূলনীতি হলোঃ (কাফের দের থেকে)যারা যুদ্ধকরার উপযোগি তাদের হত্যা করা বৈধ সে যুদ্ধেরত হোক অথবা যুদ্ধে রত না হোক।বাদায়ে ১০১/৭

قال الشوكاني: (والمشرك سواء حارب أم لم يحارب: مباح الدم ما دام مشركًا). [السيل الجرار 4/369]

শাওকানি বলেনঃ মুশরিক চাই যুদ্ধকরুক অথবা যুদ্ধ নাই করুক সে যতক্ষন মুশরিক আছে তার রক্ত ঝরানো বৈধ। আচ্ছআয়লুল জাররার ৩৬৯/৪

وتأمل قول الفاروق عمر لأبي جندل -ﷺ-: (فإنما هم مشركون، وإنما دم أحدهم: دم كلب!). رواه أحمد والبيهقي.

আর চিন্তা করো উমার রাজিঃ আবু জান্দাল রাজিঃ কে কী বলেছেন (তারা মুশরিক বৈ তো নয়, আর তাদের যে কারো রক্ত সুধু কুকুরেরে রক্ত।) আহমাদ বায়হাকির রিওয়াত।

قال القرطبي: (والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له: جاز له قتله]تفسير القرطبي 5/338]

আর মুসলিমের যদি সামনে কাফের পড়ে যায় যার সাথে কন চুক্তি নেইঃ তার জন্য জায়েয আছে একে হত্যা করে দেয়া। তাফসীরে কুরতবি ৩৩৮/৫

قال ابن كثير: (قد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أمّ البيت الحرام أو بيت المقدس) [تفسير ابن كثير 2/6]

ইবনে কাছীর বলেনঃ(ইবনে জারীর ইজমা/ঐক্যমত উল্লেখ করেছেন যে, মুশরিক কে হত্যা করা জায়েযঃযদি তার জন্য নিরা পত্তা চুক্তি নাথাকে, যদিও সে হারাম শরীফ বা বায়তুল মাকদাসে হজ্জের উদ্দ্যশ্যে গমন করে, তাফসীরে ইবনে কাছীর ৬/২।

)أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم: لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يتقدم له أمان)[تفسير الطبري6/61]بتصرف

সবাই ঐক্যমত যে মুশরিক যদি হারাম শরিফের সব গাছের বাকল /লতা পাতা দিয়েও নিজের বাহু,গলা জড়িয়ে রাখেঃ এটা তাকে হত্যা থেকে নিরাপদ করবেনা যদি আগে থেকে নিরাপত্ত্বাচুক্তি নাথাকে। তাফসীরে তাবারি ৬১/৬ ইষৎপরিবর্তিত

قال الإمام النووي: (وأما من لا عهد له، ولا أمان من الكفار: فلا ضمان في قتله على أي دين كان) [روضة الطالبين 9/259]

ইমাম নববি বলেনঃ(আর যেসব কাফের দের সাথে সন্ধি বা নিরাপত্ত্বাচুক্তি নেইঃ তাকে হত্যা করলে কোন রক্তমুল্য নেই সে যে ধর্মের অনুসারিই হোক না কেন। রাউজাতুত্তালিবীন ২৫৯/৯

قال ابن مفلح: (ولا تجب بقتله ديّة ولا كفارة -أي الكافر من لا أمان له- لأنه مباح الدم على الإطلاق كالخنزير) [المبدع8/263]

ইবনে মুফলিহ রাহঃ বলেন(তাকে হত্যা করার দ্বারা দিয়াত (রক্তপন) বা কাফফারা ওয়াজিব হবেনা - অর্থাৎ কাফের তার আমান (নিরাপত্তা চুক্তি) নেই- কারন তার সাভাবিক ভাবে রক্তবৈধ যেমন শুকর। আল্মুব্দি ২৬৩/৮

قال الإمام الشافعي: (الله تبارك وتعالى أباح دم الكافر وماله إلا بأن يؤدي الجزية أو يستأمن إلى مدة). [الأم 1/264]

ইমাম শাফেয়ি রাহঃ বলেন মহামহিম আল্লাহ তায়ালা কাফেরের রক্ত ও সম্পদ বৈধ করে দিয়েছেন হ্যাঁ তবে যদি সে জিযয়া দেয় অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিরাপত্ত্বা লাভ করে নেয়,(তাহলে সে সেটা পাবে)আলউম্ম ২৬৪/১

قال الشوكاني: (أما الكفار فدماؤهم على أصل الإباحة كما في آية السبف؛ فكيف إذا نصبوا الحرب...). [السيل الجرار4/522]

শাওকানি বলেনঃ কফের দের রক্ত মৌলিক ভাবেই বৈধ যেমন আয়াতুচ্ছায়ফে (নির্দেশ করা হয়েছে), আরযদি তারা যুদ্ধ বাধিয়ে রাখে তাহলে?(আর কী কথা) আচ্ছায়লুল জাররার ৫২২/৪

শাইখ হারিস আন-নাজ্জারি তার **دروسٌ في التوحيدِ والقتال** এর তিন নং দরস **الكافرُ المعصومُ الدم** অর্থাৎ কাফেরের রক্ত হালাল এখানে লিখেনঃ

الكفار المحاربون هم الذين ليس لهم مع المسلمين عهد ولا ذمة، فإذا لم يكن بين الكفار وبين المسلمين عهد فهم أهل حرب؛ وإن لم تكن الحرب قائمة، كل من ليس له عهد مع المسلمين من أمان فهو من أهل الحرب مع المسلمين وهذه مسألة إجماعية وليست مسألة اجتهادية أو قول الجمهور بل انعقد الإجماع على هذا كما قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير جامع البيان، قال رحمه الله : "أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانًا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان " يقول لو أن الكافر اعتصم بجميع أشجار الحرم التي يحرم قطعها لو اعتصم بها جميعًا لم يكن ذلك أمانًا له حتى يعطيه المسلمون الأمان

(মুহারিব) যুদ্ধা কাফের হলো তারা যাদের সাথে মুসলিমদের কোন সন্ধি বা চুক্তি নেই, যদি কাফেরদের মাঝে আর মুসলমানদের মাঝে কোন সন্ধি নাথাকে তাহলে তারা আহলে হারব অর্থাৎ যুদ্ধ উপযোগি যুদ্ধা, যদিও এখন যুদ্ধবেধেগিয়ে না থাকে, যাদের মাঝে আর মুসলিমদের মাঝে কোন নিরা পত্ত্বা সন্ধি নেই তারাই মুসলমানদের জন্য যুদ্ধপোযোগি যুদ্ধা।

এটা একটি ইজমায়ি তথা সর্বসম্মত মাসআলা , কোন মতোবিরোধ যুক্ত বা গবেষনাযোগ্য মাসয়ালা নহে ,অথবা জুমহুর তথা বেশি সংখ্যকের অভিমত এমন ও নহে,বরং এর উপর ঐকমত্য সম্পন্ন হয়েছে যেমন ইমাম তাবারি রাহিঃ তাফসীরে জামিউল বায়ানে বলেনঃ সকলেই ঐকমত যে মুশরিক যদি হারাম শরিফের সব গাছের বাকল /লতা পাতা দিয়েও নিজের বাহু,গলা জড়িয়ে রাখেঃ এটা তাকে হত্যা থেকে নিরাপদ করবেনা , আগে থেকে যদি মুসলমানদের পক্ষ থেকে নিরাপত্ত্বাচুক্তি অথবা করারোপের মাধ্যমে নিরাপত্ত্বা না দেয়া থাকে। তিনি বলেন যে কাফের যদি হরমের তাবতঐসব বাকল দ্বারাও নিজেকে জড়িয়ে রাখে যে গুলো কাটা হারাম/ নিষীদ্ধ এই সব গুলোধরেও যদি আশ্রয়ি হয় তবো এটা তার জন্য নিরাপত্ত্বা বিধান করবেনা, যতক্ষন মুসলিমগন তাকে নিরাপত্ত্বা না দিবে। বর্তমান পৃথীবিতে মুজাহিদ দের সাথে কাফের গুষ্ঠির যুদ্ধ উভয় পক্ষ থেকে প্রকাশ্য স্পষ্টঘোষিত ভাবে বিদ্যমান এমন কেহ আছে যে এই যুদ্ধের ব্যপারে বেখবর? এর বেনিফিটের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই?

এখন পুরা দুনিয়া দুই ভাগে বিভক্ত ফুস্তাতু ইমান ফুস্তাতু নিফাক্ব , এক পক্ষ মুসলিম মুকাতিল মুজাহিদীন অপর পক্ষ তাদের কে জংগিবাদি আখ্যায়িত করে এদের দমনে সচেষ্ট,এই মুজাহিদীনের সাথে যেসব কাফের দের সন্ধি বা নিরাপত্ত্বাচুক্তি নেই তাদের বেপারে মুজাহিদীনের কোন দায় দায়িত্ব নেই। আবু বাছীর উৎবা রাজিঃ দুই কাফেরের এক কাফের কে হত্যা করে দিয়েছেন, (বুখারি) অথচ সেই কাফের দের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া ছাল্লামের চুক্তি ছিল, পরবর্তিতে আবুজান্দাল সহ তার বাহিনী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়া সাল্লামের সাথে সন্ধিকৃত কুরায়শদের বিরোদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, সেই যুদ্ধকে তখন আবুসুফিয়ান ও অন্যান্য কাফের ও অযৌক্তিক বলেনাই।আর এখন কিছু নাম ধারি ... তাগুত মুরতাদ মুজাহিদের শত্রুদের আশ্রিত কাফের দের হত্যার উপর প্রশ্ন তোলে । এটা কি মুর্খতা, অজ্ঞতা না মুনাফেকির কোন প্রকার? আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন, বিশ্বময় এই ইমান কুফরের জিহাদে মুজাহীদ গবেষক উলামায়ে কিরাম যাদের হাতে মুসহাফ-সাইফ, কিতাব-কিতাল, হাদীস-হাদীদ এক সাথে রয়েছে সেই আহলে সুগুর উলামাদের থেকে মাসয়ালা নিতেহবে। যেমনটি বলেছেন ইমাম আহমাদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ,আর যেটি সব ফুকাহায়ে কিরামের ঐকমত্য সিদ্ধান্ত যে যারা যুগের ঘটনা বলির নেপথ্য জ্ঞান রাখেনা তারা

আর মুর্খ সমান। ইবনুল কায়্যিম বলেন তারা মানূষদের বিভ্রান্ত কারি ইমাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন আমার উম্মতের জন্য দাজ্জালের পরে সবচেয়ে ভয় করি বিভ্রান্ত কারি ইমামদের।কবি ইকবাল বলেন যে তুমাদের কাফেরদের গুলামি শিখায় সে ইমাম নহে।

আশা করি এখান থেকে নিরেপক্ষ ভাবে আলোচনার খোরাক পাওয়া যাবে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩৬৪৭

শেখ হাসিনা প্রশ্ন করেছেনঃ মানুষের তৈরি আইন মানতে সমস্যা কোথায়?

Shabab Abdullah

Member

০৮-০৪-২০১৬

শেখ হাসিনা প্রশ্ন করেছেনঃ মানুষের তৈরি গাড়ি, মানুষের তৈরি পোশাক ব্যবহার করতে পারলে। মানুষের তৈরি আইন মানতে সমস্যা কোথায়?

#উত্তরঃ

শায়খ আনওয়ার আল আওলাকি (রহ) বলেন, "বর্তমানে মুসলমানদের উপর এমন সব শাসক চেপে বসে আছে যাদের পক্ষে এত বড় মুসলিম অধ্যুষিত ভূখন্ড দূরে থাকুক, এক পাল ভেড়া চড়ানোর সামর্থও এরা রাখে না।"।

১৬ কোটি মুসলমানের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসা শেখ হাসিনা সম্প্রতি এমন এক মন্তব্যের অবতারণা করেছেন যা ধৃষ্টতা, অজ্ঞতা ও মূর্খতার সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

এই মন্তব্যের ফলে, বাংলার জমিনের সর্বনিকৃষ্ট, ফিরাউনতূল্য শাসক হিসেবে সে নিজেকে প্রমাণিত করেছে...

সুরা মায়েদার, ৪৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ আরও বলেনঃ

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"...যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।"

সে আল্লাহ তা'আলার সাথে গুণাবলী মানুষকে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন...

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

"..তিনি নিজ হুকুম ও বিধানের কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না।" সুরা কাহফ, ২৬

তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পাদ্রী ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারিয়ামের পুত্র মসীহকেও, অথচ তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ করা হয়েছিল যে তারা শুধু এক মা'বুদের ইবাদত করবে যিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি তাদের অংশীদারিত্ব স্থির করা হতে পবিত্র। [সূরা তাওবা: ৩১] আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীণ হয়েছে তার উপর তারা ঈমান এনেছে, ইহা সত্ত্বেও তারা তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করছে। অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যাতে তারা তকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে শয়তান ইচ্ছা করছে তাদেরকে পরিপূর্ণ পথভ্রষ্ট করে ফেলতে। [সূরা-নিসা, আয়াত:৬০]

মুসলমানদের ঐক্যমতে, আল্লাহ তা'আলা প্রণীত শারিয়াহ ব্যতিরেকে বিচারকারী ব্যক্তি তাগুত এবং তার আনুগত্যকারী কাফির।

নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদের নিকট ওহী প্রেরণ করে, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করে। আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, নিশ্চিত তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। [সূরা আনআম: ১২১]

ইবনে কাসীর (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إِلَى قول غيره ، فقدمتم ذلك، فهذا هو الشرك

আল্লাহর তায়ালার বাণী - "যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে"

অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর আদেশ ও শরীয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য কারো কথার দিকে দৃষ্টি দাও এবং সেটিকেই প্রাধান্য দাও তাহলে সেটি হবে শিরক। [তাফসীরে ইবনে কাছীর, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:৩২৯]

অথচ, এই জালিম মহিলা বলছে কি না মানুষের তৈরি পোশাক পরতে পারলে মানুষের তৈরি আইন মানাতেও সমস্যা থাকার কথা না। নাউজুবিল্লাহ। সুস্পষ্ট কুফরে আপতিত হতে সরাসরি আহ্বান জানাতে দ্বিধা জানাচ্ছে না এই তাগুত মহিলা ! কি নিদারুণ ধৃষ্টতা!!

ইমাম তবারী (রহঃ) তাগূতের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে:

والصواب من القول عندي في"الطاغوت"، أنه كل ذي طغيان على الله، فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، وإنسانا كان ذلك المعبود، أوشيطانا، أووثنا، أوصنما، أوكائنا ما كان من شيء.

আমার মতে তাগূতের সঠিক সংজ্ঞা হলো: সেই হলো তাগূত যে আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হয়। ফলে আল্লাহ তায়ালাকে ব্যতিরেকে তারই উপাসনা করা হয়, হয়তো তার পক্ষ থেকে উপাসনাকারীকে বাধ্য করার কারণে অথবা উপাসনাকারীর তার প্রতি আনুগত্য থাকার কারণে। সেই উপাস্য হতে পারে মানুষ অথবা শয়তান, মূর্তি অথবা ভিন্ন কোন পূজনীয় বস্তু বা অন্য যে কোন বস্তু। [তাফসীরে তবারী, খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:২১]

এই মূর্খ মহিলার যুক্তি মানতে গেলে তো যে মুচি আমার জুতা সেলাই করে দেয় তার নিঃশর্ত আনুগত্য করাও কর্তব্য। যে বাবুর্চি রান্না করে দেয় তার আনুগত্য করাও কর্তব্য।

এই মূর্খ মহিলার কাছে পাল্টা প্রশ্ন থাকবে...

কাপড় তৈরি মূল উপাদান সূতা প্রস্তুত কিভাবে সম্ভব হতো যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রেশম, তুত সৃষ্টি না করতেন?

গাড়ি তৈরির কোনো উপাদানই তৈরি করা সম্ভব আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট তামা, লোহা এবং অন্যান্য ধাতুর সাহায্য না নিয়ে?

মানুষের পক্ষে শুধুমাত্র বস্তুর রূপান্তর সম্ভব। পুরো দুনিয়া একত্রিত হলেও, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সৃষ্ট বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকে শূন্য থেকে একটা চিনির দানাও সৃষ্টি করা সম্ভবপর হবে না।

মূলতঃ চক্ষুষ্মানদের নিকট এই মূর্খ মহিলার যুক্তির আলোকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার আইন না মানা হবে চূড়ান্ত ধৃষ্টতা, অকৃতজ্ঞতা ও অসততা...

"সৃষ্টি যার বিধান তার।"

সুরা কাহফের, ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহুওয়াতা'আলা বলেছেন-

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

"..তিনি নিজ হুকুম ও বিধানের কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করেন না।"

বাংলার ফিরাউন শেখ হাসিনার কাছে প্রশ্ন রইলো,

কার হুকুমে এই বিশ্ব জগতের সৃষ্টি আর হুকুমেই বা এর ধ্বংস?

কার হুকুমে চলে চাঁদ, সূর্য আর সমস্ত অজানা নক্ষত্র?

কার হুকুমে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি অগ্নুৎপাত করে?

কার হুকুমে উত্তাল সাগর ফুঁসে উঠে আর কার হুকুমেই বা তা ঠান্ডা হয়?

কার হুকুমে বৃষ্টির সুসংবাদ বহন করে নিয়ে আসা কালো মেঘের বুক ফেটে অঝোর ধারায় বৃষ্টি হয়?

কার হুকুমে দুটি সাগরের পানি এক হয়ে মিশে যায়না?

কার হুকুমে জীবিত হয় মৃত আর মৃত হয় জীবিত?

যদি নিজেকে রব দাবি করতে চাও তাহলে এগুলোর কোন একটা করে দেখাও, পারলে সূর্য কে পশ্চিম থেকে উঠাও, পারলে নিজের মৃত পূর্ব পুরুষ কে মাটির নিচ থেকে জীবিত করে নিয়ে এসো, পারলে সাগরের সমস্ত প্রানী কে একবেলা ভর পেট খাবার খাওয়াও....

এগুলোর কোনটাই যদি তোমার হুকুমে না হয় এবং সবই যদি আল্লাহর হুকুমে হয়, এবং আল্লাহ তা'আলা যা অতি সহজেই করে থাকেন তার কোনোটিই যদি তোমার সাধ্যের বাইরে হয়ে থাকে, তাহলে.....

আরেকবার তোমার নিজের মন গড়া হুকুমে, তোমার নিজের মন গড়া বিধান দিয়ে আল্লাহর রাজত্বে আল্লাহর বান্দাদের উপর জুলুম করার আগে তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই....

তোমার, আমার এবং সৃষ্টি জগতের মালিক সুরা ইউসুফের, ৪০ নং আয়াতে বলেছেন –

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"... আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।"

ইবনু কাসীর (রহ.) তার আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবে চেঙ্গিস খান এবং তাতারীদের আল ইয়াসেক কিতাব সম্পর্কে লিখেছেন-

"অতএব কেউ যদি খাতুমুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সা.) এর উপর নাযিলকৃত শারীয়াহ ছেড়ে, পূর্বে নাযিলকৃত অন্য কোন শারীয়াহ দ্বারা বিচার করে ও শাসনকার্য চালায়, যা রহিত হয়ে গেছে, তবে সে কাফের হয়ে গেছে। তবে (চিন্তা করুন) সেই ব্যক্তির অবস্থা কি রূপ যে ইয়াসেকের ভিত্তিতে শাসন করে এবং একে ইসলামী শারীয়াহ'র উপর স্থান দেয়? এরকম যেই করবে সে

মুসলিমদের ইজমা অনুযায়ী কাফের।"

[দেখুন আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃঃ ১১৮-১১৯]

আমাদের সামনে উলামাগনের ইজমা আছে, আমাদের সামনে এই ইজমার ব্যাপারে ইবনে হাযাম (রহ.)'র সাক্ষ্য আছে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রহ.) এবং ইবন কাসির (রহ.)'র সাক্ষ্য আছে

– আর এর বাইরে কি আছে?

অর্থাৎ উলামাগনের ইজমা আছে, এবং ইজমা থাকার ব্যাপারে মহান উলামাগনের সাক্ষ্য আছে, তাহলে কিসে তোমাদের এ ব্যাপারে সত্য বলা থেকে বাধা দিচ্ছে?

কিসে তোমাদের বাধা দিচ্ছে? তোমাদের বাধা দিচ্ছে গোমরাহি, বিচ্যুতি, ইরজা, আর আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ নিয়ে খেল তামাশা।

আর তোমরা যারা আল্লাহর দাসদের মধ্য থেকে কাউকে তোমাদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছো, তোমরা শুনে নাও...

"যেসব লোক আল্লাহ তায়ালার বদলে অন্য কাউকে নিজেদের অভিভাবক হিসাবে গ্রহন করে, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে মাকড়সার ঘরের মত, সে ঘর বানায়, আর দুনিয়ার দুর্বলতম ঘর হচ্ছে এই মাকড়সার ঘর। কত ভালো হত যদি তারা এই সত্যটুকু বুঝতে পারতো।"

(সুরা আনকাবুত, ৪১)

পরিশেষে, সত্য প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিধাগ্রস্ত থাকবে শুধুমাত্র বিক্রীত ও বিকৃতরাই। পুরো দুনিয়ার নিকট আজ স্পষ্ট, শেখ হাসিনা নিজেকে ফিরাউনের ন্যায় নিজেকে অহংকারী করে তুলেছে...

এবং, প্রতিটি ফিরাউনের জন্যই রয়েছে একজন মুসা (আ)...

প্রতিটি আবু জাহিলের জন্য রয়েছে একজন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)...
প্রতিটি বুশের জন্য রয়েছে একজন উসামা (রাহিমাহুল্লাহ)...

নিশ্চয়ই হাসিনার জন্যও রয়েছে তেমন কেউ... বি'ইজনিল্লাহ...

ইয়া আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন... আমি পৌঁছে দিয়েছি।

পোস্ট লিংক ; https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩৯৪১

কুফর দুনা কুফর

Zakaria Abdullah

Senior Member

০৮-০৬-২০১৬

এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি উক্তির কারণে অনেকেই সঠিকভাবে ব্যাপারটি বুঝতে ভুল করেন। উক্তিটি এরকম :

عن طاؤس عن عباس فى قوله "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ " قال ليس بالكفر الذى تذهبون إليه ، رواه الحاكم فى مستدركه من حديث سفيان بن عيينة و قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انظر ابن كثير

–ত্বাউস (রঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই কাফির’ এই আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করে বলেন যে, আয়াতে উল্লেখিত কুফর বলতে তোমরা যা মনে করে থাকো তা নয়। এ বর্ণনাটি হাকিমও উদ্ধৃত করেছেন তার মুসতাদরাক গ্রন্থে সুফইয়ান বিন উইয়ায়নার বরাতে এবং বুখারী মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলেছেন। (ইবনে কাসীর ২ - ৮৫/৮৬)

এই আছারের উপর ভিত্তি করে তথাকথিত সালাফী / আহলে হাদিস আলেমগণ আল্লাহর অবতীর্ণ আইন-বিধান ব্যতীত শাসন ও বিচার-ফায়সালার শুধুমাত্র পাঁচটি অবস্থা উল্লেখ করেছেন,

(১) যে মানব রচিত আইন-বিধানকে আল্লাহর বিধানের চেয়ে উত্তম ও উপযোগী মনে করবে সে প্রকৃত কাফির

(২) যে ব্যক্তি উভয় প্রকার আইন-বিধানকে সমানভাবে বৈধ মনে করবে সে প্রকৃত কাফির

(৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন-বিধানকে উত্তম বিশ্বাস করতঃ মানব রচিত আইন-বিধান দ্বারা শাসন করা বৈধ মনে করে সেও প্রকৃত কাফির

(৪) যে ব্যক্তি মানব রচিত আইন-বিধানকেই আল্লাহর আইন-বিধান বলে দাবী করবে সেও প্রকৃত কাফির

(৫) যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর আইন-বিধান দ্বারা শাসন করাই উত্তম ও কর্তব্য এবং মানব রচিত আইন-বিধান দ্বারা শাসন করা অবৈধ ও বর্জনীয় কিন্তু পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার চাপের মুখে তা বাস্তবায়ন করতে পারে না। এ ব্যক্তি ছোট ও অপ্রকৃত কাফির। এর মাধ্যমে সে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হবে না। (দেখুন আল-উরওয়াতুল উছক্বা ১৬৭-১৬৮)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, উপরুক্ত ভাগ অনুযায়ী প্রথম চারটির সাথে অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ মানব-রচিত বিধান দিয়ে শাসনকে মনে মনে বৈধ মনে করা। তারা বড় কুফরীকে শুধুমাত্র অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত করেন। কিন্তু অন্তরে বৈধ মনে না করলে, মানবরচিত বিধান দিয়ে শাসনকে তারা ৫ম ভাগে অর্থাৎ কুফর দুনা কুফর মনে করেন। কিন্তু তারা এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অন্যান্য ক্বওল কিংবা অন্যান্য সালাফদের ক্বওল খেয়াল রাখতে ভুলে যান।

এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অপর একটি উক্তি হচ্ছে : **أخرج وكيع في أخبار القضاة :(١/٨٤)**

حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال أخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :" سئل ابن عباس عن قوله { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قال: كفى به كفره

وهذا الأثر صحيح الإسناد إلى ابن عباس ﷺ ؛ رجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ وكيع: الحسن بن أبي الربيع الجرجاني وهو ابن الجعد العبدي. قال ابن أبي

حاتم: سمعت منه مع أبي وهو صدوق ، وذكره ابن حبان في الثقات [انظر تهذيب التهذيب [১/৫১৫ ، وقال الحافظ في التقريب" : (১/৫০৫) صدوق

ইমাম ওয়াকি (র.) আখবারুল কুদা (১/৪১)-এ বলেন : আল হাসান বিন আবি রাবিয় আমাকে বর্ণনা করেছেন, আমাকে আব্দুর রাজ্জাক মুয়ামার হতে, তিনি ইবনে তাউস হতে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস (রা.)-কে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করেনা, তারাই কাফির' Ñ এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : এটা যথেষ্ট কুফর। ইবনে আব্বাস (রা.) পর্যন্ত এই সনদটি সহীহ। এর সকল ব্যক্তিই (বুখারী-মুসলিমের রাবীদের অন্তর্ভূক্ত) সহীহ, শুধুমাত্র ওয়াকি এর শায়খ, আল হাসান বিন আবি রাবিয় ব্যতীত। আর তিনি হলেন ইবনে আল জায়দ আল আবদি। ইবনে আবি হাতিম বলেন, আমি আমার পিতার সাথে তার কাছ থেকে শুনেছি তিনি সত্যবাদী। ইবনে হিব্বান তাকে আল সিকাহতে উল্লেখ করেছেন (তাহজীব আৎ তাহজীব : ১/৫১৫)। হাফিজ ইবনে হাজার (র.) বলেছেন, তিনি সত্যবাদী। (আৎ-তাক্বরীব ১/৫০৫)

ইবনে আব্বাস (রা.)-এর, 'এটা যথেষ্ট কুফর' কথা থেকে বুঝা যায় এ কাজ বড় কুফরী।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর দুইটি ক্বওল পেলাম। একটা আরেকটার সাথে সাংঘর্ষিক। তাহলে স্বভাবতই এই আয়াতের ব্যাপারে অন্যান্য সাহাবা (রাঃ) এর ক্বওল অগ্রাধিকার পাবে।

আর এই আয়াতের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে :

عن مسروق قال: " كنت جالساً عند عبدالله (يعني ابن مسعود) فقال له رجل :ما السحت ؟ قال : الرشا. فقال : في الحكم ؟ قال: ذاك الكفر ثم قرأ {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" { وأخرج أبويعلى في مسنده (৫২৬৬)

وأخرجه البيهقي (১০/১৩৯) ووكيع في أخبار القضاة (১/৫২)، وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (২/২৫০) ونسبه لمسدد ، ونقل الشيخ

حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على المطالب العالية قول البوصيري : " رواه مسدد و أبويعلى والطبر اني موقوفاً بإسناد صحيح والحاكم وعنه البيهقي. "...

ইমাম আবু ইয়ালা মাসরুক হতে বর্ণনা করেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট বসা ছিলাম, এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো, সুহুত (অবৈধ উপার্জন) কি? তিনি বললেন, এটা হচ্ছে ঘুষ, সে বললো, বিচার কাজে? তিনি বললেন, এটা যথেষ্ট কুফরী। -মুসানাদে আবু ইয়ালা (৫২৬৬), ইমাম বায়হাকী (১০/১৩৯), ইমাম ওয়াকি-এর আখবারুল কুদা (১/৫২), হাফিজ ইবনে হাজার (র.) মাতালিবুল আলিয়া (২/২৫০)-তে বর্ণনা করেন এবং মুসাদ্দাদ -এর প্রতি সম্পর্কিত করেন। এছাড়াও শাইখ হাবিবুর রাহমান আল-আজামী মাতালিবুল আলিয়া-এর টীকায় আল-বুসিরি-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করেন, মুসাদ্দাদ, আবু ইয়ালা ও তাবরানী সহীহ সূত্রে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আল-হাকিম

সুতরাং এই আয়াতের ব্যাখ্যায় দেখা যাচ্ছেঃ ইবনে আব্বাস (রঃ) এর একটি ক্বওলে কুফর দুনা কুফর বলা হলেও, অপর ক্বওলে এটাকে বড় কুফর বলা হচ্ছে। একইভাবে ইবনে মাসউলদ (রাঃ) এর ক্বওলে এটা বড় কুফর হিসেবে এসেছে।

আর অনেকে যেভাবে মনে করেন, শুধু এই আয়াতের অর্থ কুফর দুনা কুফর প্রমাণ করতে পারলে তারা বর্তমান মুরতাদ শাসকদেরকে রক্ষা করতে পারবেন, ব্যাপারটা মোটেও তা না। শুধু এই এক আয়াতের উপর ভিত্তি করে উলামারা এ সকল শাসককে কাফির বলেন না। বরং এই ব্যাপারে অনেক আয়াত আছে। আর এ ব্যাপারে একাধিক সালাফ কর্তৃক ইজমা এর উল্লেখ করা আছে। আর এটা জানা কথা, কোন ব্যাপারে সালাফদের ইজমা উল্লেখিত হলে সেই ব্যাপারে দুই/একটা আয়াতের ব্যাখ্যা দাড় করিয়ে ইজমার বিরোধিতা করার চেষ্টা করা নিতান্তই হাস্যকর একটা ব্যাপার।

প্রকৃতপক্ষে হুকুম বি গাইরি মা আনজালাল্লাহ - এর তিনটি ভাগ রয়েছে :

ক. আইন প্রণয়ন করা : আইন-এর মাধ্যমে হালাল-হারাম নির্ধারণ করা যা ইতিমধ্যে ইসলামী শরীয়াতে নির্ধারিত আছে। এটা শুধুমাত্র আল্লাহর অধিকার। যে কেউ এ কাজ করবে, সে নিঃসন্দেহে শিরকে-এ লিপ্ত হবে এবং সে কাফির।

وَالْإِنْسَانُ مَتَى حَلَّلَ الْحَرَامَ - الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ - أَوْ حَرَّمَ الْحَلَالَ - الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ - أَوْ بَدَّلَ الشَّرْعَ - الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ - كَانَ كَافِرًا مُرْتَدًّا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ .- (مجموع الفتاوى(

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন, যে ব্যক্তি সর্বসম্মতিক্রমে হারামকে (অননুমোদিত) হালাল (অনুমোদিত) করে, কিংবা সর্বসম্মতিমে হালালকে হারাম করে, অথবা সর্বসম্মতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শরীয়াতকে প্রতিস্থাপন করে, সে আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে কাফির। (মাজমু আল ফাতাওয়া : ৩/২৬৭)

খ. মানব রচিত আইন দ্বারা শাসন / বিচার করা : এর দুইটি ভাগ আছেঃ

১. সর্বদা আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য আইনে বিচার করা : এটা ইসলামী শরীয়াত পরিবর্তনের শামিল। এই ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ শাকির (র.) বলেন :

إن في الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لإخفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام . كأننا من كان . في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه) –عمدة التفسير لأحمد شاكر(

মানব রচিত আইনের এই ব্যাপারটি সূর্যের আলোর মতো পরিস্কার। এটা পরিস্কার কুফর এবং এর মধ্যে লুকানো কিছু নেই, যারা ইসলামের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে, তাদের জন্য এ অনুযায়ী কাজ করা অথবা এর কাছে আত্মসমর্পণ করা অথবা একে স্বীকার করার কোন অজুহাত নেই, সে যে কেউ হোক না কেন। তাই সবাইকেই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং প্রত্যেকে নিজের জন্য দায়ী থাকবে। তাই আলিমরা পরিস্কারভাবে সত্যকে জানিয়ে দিবেন এবং কোন কিছু গোপন করবেন না, যা বলতে ইসলাম তাদেরকে নির্দেশ দেয়, তা বলে দিবেন। (উমদাতুল তাফসীর-মুখতাছার তাফসীর ইবনে কাছীর : ৪/১৭৩-১৭৪)

২. শরীয়া আইন অপরিবর্তনীয় রেখে, ব্যক্তি স্বার্থে মাঝে মাঝে আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য আইনে বিচার করা : এই ব্যক্তি এখনো মুসলিম, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর প্রথম উক্তি এই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। সৌদি আরবের শরীয়া কাউন্সিলের প্রাক্তন গ্রান্ড মুফতী শাইখ মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম (র.) বলেন :

وأما الذي قيل فيه : كفر دون كفر. إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصر وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة نحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجح جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة - (فتَاوى ورَسَائل(

আর কুফর দুনা কুফর বলতে বুঝায়, যখন কোন বিচারক যে কোন ফায়সালার ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে বিচার করে এ অবস্থায় যে, সে জানে যে এ কাজের মাধ্যমে সে আল্লাহর অবাধ্য হচ্ছে, আল্লাহর হুকুমটাই এ ক্ষেত্রে সত্য (অধিক কল্যাণকর) এবং এ কাজ তার থেকে একবার কিংবা এরূপ অল্প সংখ্যক বার প্রকাশ পায়। এই ব্যক্তি বড় কুফরী করেনি। আর যারাই আইন প্রণয়ন করে, অন্যদেরকে তা মানতে বাধ্য করে, সেটা কুফরী যদিও তারা ভুল হয়ে যাওয়ার দাবী করে, যদিও আল্লাহর আইনকেই অধিক সত্য মনে করে, এটা হচ্ছে এমন কুফরী যাতে মানুষ দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়। (আল-ফাতাওয়া : ১২/২৮০)

গ. মানব রচিত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা : এদের কেউ কেউ কাফির আর কেউ কেউ মুসলিম যারা কুফর দুনা কুফর-এ লিপ্ত। যদিও তারা আইন-প্রণয়ন কিংবা বিচার-ফায়সালা করছে না, কিন্তু তারা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কুফরী আইন বাস্তবায়ন এবং প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত। তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরের নিকটবর্তী। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

‘যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কাফির তারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে’। (সুরা-আন্-নিসা : ৭৬)

(সংগৃহীত)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩৯৯৯

মুরতাদ হত্যা কি হুদূদের অন্তর্ভুক্ত?!!!

Green bird

Moderator

০৮-২৭-২০১৬

২০১০ থেকে ২০১৩। সাইবার জগতে চলছিল কুলাঙ্গার নাস্তিকদের অশ্লীল লাফালাফি। তাদের বিষে মাখা জঘন্য তীর একের পর এক ছুটছিল আমাদের প্রাণের স্পন্দনের ইজ্জতের দিকে। আমাদের উম্মাহাতের (উম্মাহাতুল মুমিনিন) সম্মানে বিঁধতে ছিল তাদের ধারালো খঞ্জর। এত অশ্লীল ভাষায়, এত জঘন্য শব্দে আক্রমণ করছিল যা ইতিহাসকে বাক-রুদ্ধ করেছিল।

জাগ্রত মুমিনদের হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল। চোখগুলো অশ্রু বর্ষণ করছিল। তারা ব্যথায় ছটফট করছিল। তখন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত এক দল মুমিনকে নির্বাচন করলেন। যারা মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ ও আবদুল্লাহ বিন আতিক রাদিঃ এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। যাদের হাত দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা শাতিমদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। মুমিনদের হৃদয়গুলোকে প্রশান্তি দান করেন। তাদের বিষদাঁত অনেকটা ভেঙ্গে যায়। তারা সামনে ২টি পথ দেখতে থাকে "হয়ত দেশ ছেঁড়ে পলায়ান নয়ত চাপাতির কোপে মরণ"।

কিন্তু আফসোস! শত আফসোস!, শাসকের তরবারির ভয়ে বা প্রবৃত্তের তাড়নায় অথবা দুনিয়াবি কিছু আশায়, এই বরকতময় আমালের বিরুদ্ধে এক দল আলেম অবস্থান নিতে থাকে। সংশয় ছড়াতে থাকে। নাউজুবিল্লাহ! এই মহান ইবাদাতকে সন্ত্রাস পর্যন্ত বলতে তাদের বুক একটুও কাঁপে না। মুখে একটুও বাঁধে না। কষ্টটা অনেক বেড়ে যায় যখন ঐ ব্যক্তিদের মাঝে এমন আলেমদেরকেও পাওয়া যায়, যাদেরকে উম্মত মুক্তাদা মনে করেন।

তারা নিজেদের মতকে প্রমাণ করার জন্য কিছু খোঁড়া দলীল-যুক্তি পেশ করতে থাকে। তাদের দলীল বা যুক্তি হচ্ছে এই ---

A. মুরতাদ হত্যা হুদুদের অন্তর্ভুক্ত আর হুদুদের জন্য রয়েছে অনেক শর্ত।
B. মুরতাদ হত্যার দায়িত্ব শাসকের। শাসকের অনুমতি ওয়াজিব। অনুমতি ছাড়া হত্যা হারাম।

C. তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। তাদেরকে সুযোগ দিতে হবে। এর আগে হত্যা করা জায়েজ হবে না।

আমরা ইনশাআল্লাহ ধাপে ধাপে তাদের যুক্তিগুলো খণ্ডন করব। আল্লাহ তায়ালা যদি তাউফিক দান করেন।

আমাদের আজকের আলোচনা- ---

মুরতাদ হত্যা কি হুদূদের অন্তর্ভুক্ত?!!!

প্রচলিত একটা ভুল হচ্ছে, মুরতাদ হত্যাকে হুদূদের অন্তর্ভুক্ত করা। আর হুদূদের সকল হুকুম তার মাঝে প্রয়োগ করা। অথচ, না তা হুদূদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত। আর না তার হুকুম আর হুদূদের হুকুম এক। বরং উভয়ের হুকুমের অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান।

দলীল-১
ফিকহে হানাফীর বিশিষ্ট ফকীহ আল্লাম কাসানী রহঃ হুদুদের সংখ্যার ব্যাপারে বলেনঃ

فنقول الحدود خمسة انواع حد السرقة وحد الزنا وحد الشرب وحد السكر وحد القذف-

আমাদের মত হচ্ছেঃ- হুদূদ পাঁচ প্রকারঃ-

১। চুরির হদ।

২। জেনার হদ।

৩। মদ পানের হদ।

৪। মাতালের হদ।

৫। কযফ এর হদ।

(কযফ-কারো ব্যাপারে জেনার অভিযোগ তোলা, কিন্তু তা প্রমাণ করতে না পারা)

(বাদায়েউস সানায়ে', অধ্যায়ঃ কিতাবুল হুদূদ)

দলীল-২

হানাফী মাজহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ আল্লাম ইবনে নুজাম রহঃ বলেন---

فكان حكمها الاصلي الانزجار عما يتضرر به العباد وصيانة دار الاسلام عن الفساد، ففي حد الزنا صيانة الانساب، وفي حد السرقة صيانة الاموال، وفي حد الشرب صيانة العقول، وفي حد القذف صيانة الاعراض فالحدود أربعة، وما في البدائع من أنها خمسة وجعل الخامس حد السكر فلا حاجة إليه لان حد السكر هو حد الشرب كمية وكيفية وإن اختلف السبب

হুদূদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বান্দাদেরকে তাদের ক্ষতিকারক বিষয়গুলো থেকে বিরত রাখা। দারুল ইসলামকে ফাসাদ থেকে রক্ষা করা। জেনার হদের মধ্যে নিহিত আছে, বংশের সংরক্ষণ। চুরির হদের মধ্যে রয়েছে মালের সংরক্ষণ। মদ পানের হদের মধ্যে আছে আকল-বিবেকের সংরক্ষণ। আর কযফের হদের মধ্যে ইজ্জতের সংরক্ষণ। সুতারাং হুদুদ চারটি। আর বাদায়েউস সানায়ে এর মধ্যে আছে যে, হুদূদ পাঁচটি, পাঁচ নাম্বারটি হচ্ছে মাতালের হদ। এর কোন প্রয়োজন নেই। কারণ (শাস্তির) পর্যায় ও অবস্থার দিক থেকে মদপানের যে হদ, মাতালের একই হদ। যদিও বা এর কারণ ভিন্ন হয়। (আল-বাহরুর রায়েক, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হুদূদ)

দলীল-৩

হাম্বালি মাজহাবের বিশিষ্ট ফকীহ শায়েখ মানসূর আল-বাহুতি রহঃ বলেন---

--قتل المرتد لكفره لا حدا ولايجوز أخذ فداء عنه أي عن المرتد بل يقتل بعد الاستتابة لما تقدم من قوله (ص): من بدل دينه فاقتلوه -كشاف القناع-

--- মুরতাদ কে হত্যা করা হবে তার কুফরের কারণে। হদ হিসাবে নয়। মুরতাদ থেকে ফিদিয়া নেয়াও জায়েজ নেই। বরং ইস্তেতাবের (তওবার সুযোগ দেয়া) পর তাকে হত্যা করা হবে যার কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেছেন, যে তার দ্বীনকে পরিবর্তন করে তোমরা তাকে হত্যা কর। (কাশশাফুল কেনা'য়, অধ্যায়ঃ মান ইরতাদ্দা আন দীনিল ইসলাম)

দলীল-৪

সমকালীন আরব সালাফী আলেমগণও একই মত ব্যক্ত করেছেন, মুরতাদকে হত্যা হুদূদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

শায়েখ সলেহ আল-উসাইমীন রহঃ বলেন –

الحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه بل يقتل بكل حال . أما الكفر، فإنه يستتاب صاحبه وهذا هو الفرق بين الحد، وبين عقوبة الكفروبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود وذكروا من الحدود قتل الردة فقتل المرتد ليس من الحدود- -شرح كتاب التوحيد-

হদের ব্যাপার যখন ইমাম পর্যন্ত পৌঁছবে তখন অপরাধী থেকে আর তাওবা গ্রহণ করা হবেনা বরং সর্বাবস্থায় তাকে হত্যা করা হবে। আর কুফুরের ক্ষেত্রে তাওবা চাওয়া হবে। হদ ও কুফরের শাস্তির মাঝে এটাই পার্থক্য। এর থেকে ঐ ব্যক্তিদের ভুল বুঝে আসে যারা মুরতাদের হুকুমকে হুদুদের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে, এবং রিদ্দার কারণে হত্যাকে হুদূদের মধ্য থেকে উল্লেখ করে। অথচ মুরতাদকে হত্যা হুদুদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (শরহু কিতাবিত তাউহীদ)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমাদের সামনে স্পষ্ট হল, মুরতাদকে হত্যা হুদূদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটাই উম্মতের গ্রহণযোগ্য ফুকাহাদের মত। আজ এই পর্যন্ত। আমরা ইনশাআল্লাহ সামনে বাকি ২টি সংশয় নিয়ে আলোচনা করব।

(ফেসবুক থেকে সংগৃহীত)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪২৯৯

#মুরতাদ_হত্যা_দ্বিতীয়_পর্ব : ইমামের অনুমতি, ইস্তেতাব ও তিনদিন অবকাশের বিধান

Green bird

Moderator

০৮-২৯-২০১৬

গত মজলিশে আমরা আলোচনা করে ছিলাম- মুরতাদ হত্যা হুদূদের অন্তর্ভুক্ত কি না। সঠিক মত কোনটি। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে- ইমামের অনুমতি, ইস্তেতাব বা ইসলাম পেশ করে তাওবা করতে আহ্বান করা ও তিনদিন অবকাশ দেবার বিধান"।

ইমামের অমুমতি ছাড়া হত্যা কি হারাম?

এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই, অন্যান্য বিধান বাস্তবায়ন করা যেমন মুসলিমদের খলীফা অথবা সুলতানের দায়িত্ব। একই ভাবে মুরতাদদের বিধান বাস্তবায়ন করাও তারই দায়িত্ব। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেউ যদি তাদের অনুমতি নেয়া ছাড়াই হত্যা করে তা কি নাজায়েজ বা হারাম হবে?

ফিকহে হানাফীর নির্ভরযোগ্য প্রায় সব কিতাবে এই মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে

فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره ولا شيء على القاتل ومعنى الكراهية هہنا ترك المستحب و انتفاء الضمان لأن الكفر مبيح للقتل والعرض بعد بلوغ الدعوة غيرواجب

মুরতাদের সামনে ইসলাম পেশ করার পূর্বেই যে কোন ব্যক্তি যদি মুরতাদকে হত্যা করে ফেলে তাহলে তা মাকরূহ বা অপছন্দনীয় হবে। হত্যাকারীর উপর কোন কিছু আবশ্যক হবে না। আর এখানে মাকরূহ হবার অর্থ হচ্ছে- মুস্তাহাব ছেঁড়ে দেয়া এবং হত্যাকারীর উপর রক্তপণ আবশ্যক না হওয়া। কেননা কুফরেই হত্যার বৈধতা প্রদান করে। আর দাওয়াত পৌঁছার পর পুনরায় ইসলাম পেশ ওয়াজিব নয়। (দেখুনঃ হেদায়া, অধ্যায়ঃ আহকামুল মুরাতাদ্দীন। আল-হিন্দিয়্যা, অধ্যায়ঃ

কিতাবুস সিয়ার, বাবু আহকামিল মুরাতাদ্দীন। ই'লাউস সুনান। ফাতহুল কাদীর।আল-বাহরুর রায়েক)

বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা কাজী খান বলেন –

وَرِدَّةُ الرَّجُلِ تُبْطِلُ عِصْمَةَ نَفْسِهِ حَتَّى لَوْ قَتَلَهُ الْقَاتِلُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِ السُّلْطَانِ أَوَ أَتْلَفَ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ لَا شَيْءَ عَلَيْه

কোন ব্যক্তির রিদ্দাহ তার জানের নিরাপত্তার অবসান ঘটায়। এমনকি সুলতান বা কাজীর অনুমতি ছাড়াই কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বা ভুল করে তাকে হত্যা করে ফেলে অথবা তার কোন অঙ্গহানি করে তার উপর কোন কিছুই আবশ্যক হবে না। (তাবই-নুল হাকায়েক, অধ্যায়ঃ কিতাবুস সিয়ার, বাবুল মুরাতাদ্দীন)

এটাই মুফতা বি-হী মত, এই মতের উপরেই হানাফি মাযহাবের ফাতওয়া।

হাম্বালি মাযহাবের ফকীহ শায়েখ মানসূর বাহুতি রহঃ বলেনঃ-

وإن قتله أي المرتد (غيره) أي غير الامام ونائبه بلا إذنه أساء وعزر لافتياته على الامام أو نائبه ولم يضمن القاتل المرتد لانه محل غير معصوم سواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها لانه مهدر الدم في الجملة وردته مبيحة لدمه وهي موجودة قبل الاستتابة كما هي موجودة بعدها إلا أن يلحق المرتد بدار حرب فلكل أحد قتله بلا استتابة وأخذ ما معه من مال لانه صار حربيا

ইমামা অথবা ইমামের নায়েব ছাড়া অন্য কেউ যদি অমুমতি ছাড়াই মুরতাদকে হত্যা করে তা মন্দ কাজ হবে, ইমাম বা তার নায়েবের অবাধ্যতার কারণে তাকে শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু মুরতাদের হত্যাকারী থেকে রক্তপণ নেয়া হবে না। কেননা মুরতাদের রক্ত সংরক্ষিত নয়। চাই তাকে তাওবার সুযোগ দেবার আগে হত্যা করুক অথবা পরে। কেননা সর্বাবস্থায় তার রক্তের কোন মূল্য নেই। তার রিদ্দা তার রক্তের বৈধতা দিয়েছে। আর এই বৈধতা যেভাবে ইস্তেতাবের (তাওবার সুযোগ) পরে উপস্থিত আগেও উপস্থিত। আর যদি মুরতাদ দারুল হরবে প্রবেশ করে, ইস্তেতাব ছাড়াই যে কারো জন্য অনুমোদিত, তাকে হত্যা করে ফেলা এবং তার কাছে যে মাল আছে সব নিয়ে নেয়া কেননা এখন সে হারবিতে পরিণত হয়েছে।

হত্যার পূর্বে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান ও তিন দিন অবকাশের বিধান

ফিকহে হানাফী অনুস্বারে, মুরতাদকে হত্যার পূর্বে দাওয়াত দেয়া ও ইসলাম গ্রহণের আহ্বান করা মুস্তাহাব। ওয়াজিব নয়। কেউ না করলে কোন গোনাহ হবে না। আর এই দাওয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সে যদি কোন সংশয়ের কারণে ইসলাম থেকে সরে যায় তা দূর করা। এর পর যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তো ভাল কথা আর না করলে তাকে হত্যা করতে হবে।

ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ অধিকাংশ কিতাবে মাসআলাটি বর্ণীত হয়েছে ----

وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ عَنْ الْإِسْلَامِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ كُشِفَتْ لَهُ لِأَنَّ الْعَرْضَ عَلَى مَا قَالُوا غَيْرُ وَاجِبٍ لِأَنَّ الدَّعْوَةَ قَدْ بَلَغَتْهُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ

যখন কোন মুসলিম মুরতাদ হয়ে যাবে (আল্লাহর পানাহ) তার সামনে ইসলাম পেশ করা হবে, যদি তার কোন সংশয় থাকে দূর করা হবে, আর এই ইসলাম পেশ করতে যে বলা হয়েছে, তা ওয়াজিব নয় কেননা তার কাছে দাওয়াত পৌঁছে গেছে। এমনটি হিদায়ার মধ্যেও রয়েছে। (আল-জাউহারাতুন নাইয়্যেরাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস সিয়ার)

একই মাসআলা ফিকহে হানাফীর অন্যান্য কিতাবে দেখুনঃ হিদায়া, অধ্যায়ঃ কিতাবুস সিয়ার, বাবু আহকামিল মুরতাদ্দীন। ফাতহুল কাদীর, অধ্যায়ঃ কিতাবুস সিয়ার, বাবু আহকামিল মুরতাদ্দীন। শরহুল বিকায়া, অধ্যায়ঃ আহকামুল মুরতাদ।

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইয়ূসুফ রহঃ এর মতে মুরতাদকে তাওবার জন্য তিনদিন অবকাশ দেয়া মুস্তাহাব। আর ইমাম মুহাম্মাদ রহঃ এর মতে যদি সে অবকাশ চায় তাহলে অবকাশ দিতে হবে অন্যথায় সাথে সাথেই তাকে হত্যা করতে হবে।

শামসুল আয়িম্মাহ ইমাম সারাখসী রহঃ বলেনঃ

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُؤَجِّلَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ طَلَبَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَطْلُبْ

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবূ ইয়ূসুফ রহঃ থেকে বর্ণীত আছে, ইমামের জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে মুরতাদকে তিনদিন অবকাশ দেয়া, সে অবকাশ চাক বা না চাক। (আল-মাবসূত, অধ্যায়ঃ কিতাবুস সিয়ার, বাবুল মুরতাদ্দীন)

ইমাম মুহাম্মাদ রহঃ বলেন-

وإذا ارتد المسلم عن الإسلام عرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل مكانه، إلا أن يطلب أن يؤجله، فإن طلب ذلك أجّل ثلاثة أيام

যখন মুসলিম ইসলাম ছেঁড়ে মুরতাদ হবে তার সামনে ইসলাম পেশ করা হবে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তো ঠিক আছে অন্যথায় তাকে সেখানেই হত্যা করা হবে তবে যদি সে অবকাশ চায় তাকে তিন দিনের অবকাশ দেয়া হবে। (আস-সিয়ারুল কাবীর)

পূর্বের আলোচনার সারমর্ম

- মুরতাদ হত্যা হুদূদের অন্তর্ভুক্ত নয়।
- সাধারণ মুরতাদকে ইমামের অনুমতি ছাড়া হত্যা করা মাকরূহ।
- যে কেউ হত্যা করে হত্যাকারীর উপর কোন রক্তপণ আসবে না।
- হত্যার পূর্বে ইস্তেতাব (তওবা করতে বলা) মুস্তাহাব।
- তিনদিন অবকাশ দেয়া মুস্তাহাব।

বিঃ দ্রঃ আমাদের উপরোক্ত সকল আলোচনা হচ্ছে **الردة المجردة** (আর-রিদ্দাতুল মুজাররাদাহ) বা স্বাভাবিক রিদ্দার ব্যাপারে। আমরা ইনশাআল্লাহ সামনে **الردة المغلظة** (আর-রিদ্দাতুল মুগাল্লাজাহ) নিয়ে আলোচনা করব। আর-রিদ্দাতুল মুগাল্লাজাহ হচ্ছে, মুরতাদ শুধু মাত্র দ্বীন থেকে বের হবার অপরাধেই অপরাধী থাকেনা বরং সাথে আরও কোন গুরুত্বর অপরাধে লিপ্ত হয়। যেমনঃ আল্লাহ তায়ালা অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শানে খারাপ বাক্য উচ্চারণ। দ্বীন নিয়ে ঠাট্টা। মুসলিমদেরকে হত্যা করা। দারুল হারবের কাফেরদের সাথে মিলিত হওয়া।

(ফেসবুক থেকে সংগৃহীত)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪৩২৭

কেন আমেরিকা ও এর মিত্ররাষ্ট্রের সকল কাফের নাগরিক হত্যাযোগ্য ? জ্ঞানপাপীদের প্রত্যুত্তরসহ...!

Abu Khubaib

Senior Member

০৯-২৩-২০১৬

(বুঝের ভুল-ত্রুটি থাকলে যেন আলেম ভাইরা ধরিয়ে দেন; ফোরামে পোস্ট করার অন্যতম উদ্দেশ্য এটি)

পরাজিত মানসিকতা লালনকারী সরকারি সালাফিরা, বিভ্রান্ত শাসকপ্রেমী কিছু আলেম ও কিছু আধুনিকতার মোহে অন্ধ ব্যক্তিরা বলে থাকে, "বর্তমানে আমেরিকা ও অন্যান্য কাফের দেশগুলোর নাগরিকেরা মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কাফের, তাই তাদের রক্ত ও সম্পদ হারাম। তাদের হত্যা করলে কবিরা গুনাহ হবে।"

অতঃপর তারা জিম্মি, চুক্তিবদ্ধ ও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কাফির হত্যা করার পরিণতি সংক্রান্ত হাদিস নিয়ে আসে। এছাড়াও, আমেরিকার জনসাধারণকে আমভাবে নিশানা বানানোকে তারা হারাম বলে।

তারা আরও বলে,

"আর যদি চুক্তিবদ্ধ কাফের তারা নাও হয় তবুও আমেরিকা ও সমগোত্রীয় অন্যান্য জাতির 'সাধারণ' নাগরিকদের কেন হত্যা করা বৈধ হবে যেখানে অনেকেই আছে যারা তাদের দেশের প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর জুলুম সমর্থন করেনা! ??"

ইংল্যান্ডের সরকারি সালাফি, বিল্লাল ফিলিপসের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আমেরিকান ব্যক্তিত্ব আবু উসামা তহাবি বলেছে,

"আনওয়ার আল আওলাকি বলেছে, আমেরিকা নামক জাতিটির সকলকেই হত্যা করাই জায়েজ। এটা শোনার পর আমার গায়ের লোম দাড়িয়ে যায়। আমার কাফের জন্মদাতা আমেরিকার কর্মকান্ড (ইরাক-আফগানিস্তানে আমেরিকা যা করেছে) সমর্থন করে না। তাঁকে হত্যা করা কেন জায়েজ হবে!!?"

এছাড়াও, ফেইসবুকের সালাফি ঘরানার আধুনিক এক ব্যক্তি আসিফ শিবগাত ভুইয়া, শায়েখ সালাহ আস-সাওয়ী নামক আমেরিকায় বসবাসকারী একজন কথিত "আলিম" এর বক্তব্যের রেফারেন্স টেনে দাবী করেছে,

"শায়েখ সালাহের মতে এখনকার প্রায় সব অমুসলিম দেশের নাগরিকই মু'আহিদ (মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ) ক্যাটাগরিতে পড়বে যেহেতু বর্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেরই একে অপরের সাথে সাধারণ শান্তিচুক্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। উপযুক্ত কারণ এবং উপযুক্ত কর্তৃত্ব ছাড়া হত্যা করবে তার বিরুদ্ধে দুনিয়াতে কিসাসের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে (খুব সংক্ষেপে কিসাসের অর্থ হোলো যে হত্যাকারীকে মৃত্যদন্ড দেয়া হবে যদি না নিহতের পরিবার তাকে রক্তপণের বিনিময়ে অব্যাহতি দেয়) এবং আখিরাতে এর ফল তাকে ভোগ করতে হতে পারে।"

**দেখুন আসিফ শিবগাত ভুইয়া বলছেন, মু'আহিদকে যদি কোনো মুসলিম হত্যা করে তার উপর ক্বিসাসের শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। অথচ, কাফির হত্যার কারণে মুসলিম হত্যা করা জায়েজ নেই।*

হানাফি ফকিহদের মতে ক্বিসাস বৈধ হবে কেবলমাত্র যদি দিয়াত পরিশোধ না করা হয়। মুসলিম হত্যার ফলে যে কিসাস প্রয়োগ হয় তার সাথে কাফির হত্যার কিসাস (তাও শুধুমাত্র হানাফি ফকিহদের আলোকে) সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় কেননা মুসলিম হত্যা করা হলে দিয়াত দিয়ে কিসাস প্রতিহত করা যায় না।

নিরসন

প্রথমত, বিশেষ করে আমেরিকা, তার আজ্ঞাবাহী nato, amisom ভুক্ত অন্যান্য কাফের জাতি যারা মুসলিম নিধনে ব্যস্ত তাদের সাথে হওয়া আদৌ কোনো চুক্তি যদি বৈধ ধরেও নেই তবুও সেই চুক্তি বহাল আছে কি না তা দেখা প্রয়োজন!

যারা এসকল কাফেরদের সাথে চুক্তি করছে মুসলিমদের প্রতিনিধি হিসেবে, সেসকল শাসকেরা মুসলিম কি না সেটাই প্রথম প্রশ্ন! কেননা মুরতাদরা কখনোই মুসলিমদের পক্ষ হতে শান্তিচুক্তি করতে পারে না। তবে তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া যাক, আমেরিকা ও অন্যান্য কাফের রাষ্ট্রের কাফেররা চুক্তিবদ্ধ অবস্থাতে ছিল।

কিন্তু এটা সর্বসম্মত নীতি যে, মুসলিম হত্যা করার সাথে সাথেই একজন চুক্তিবদ্ধ কাফেরের চুক্তি ভেঙ্গে যায়। কাফেররা মুসলিম হত্যা করে ফেললে সেটা কীভাবে শান্তিচুক্তি হিসেবে বহাল থাকে!!!!!

আল্লাহু আকবার!

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

তোমাদের কী হয়েছে, তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ!?

চুক্তিবদ্ধ কাফের তো দুরের বিষয়, মুসলিম হত্যা করার সাথে সাথে মুসলিম রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জিম্মি কাফেররাও হত্যাযোগ্য কাফেরে পরিণত হয়। এটি দ্বীন ইসলামের একটি চূড়ান্ত বিষয়।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেন,

"ইসলামের বিধিবিধান মেনে নিয়ে যে সমস্ত যিম্মী নিরাপত্তার অঙ্গিকার নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করবে, তারা যদি এমন কোন অপরাধ করে, যার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদন্ড, তাহলে ইসলাম তাকে হত্যা করা হতে রেহাই দিবেনা।" (মুখতাসার জাদুল মা'আদ, পৃষ্ঠা ২০৯)

তাহলে যারা জিম্মি (মুসলিম শাসকের অধীনে জিজিয়া কর দিয়ে বসবাসকারী কাফের) নয় বরং, চুক্তিবদ্ধ কাফের তাদের ব্যাপারে বিধান কী হবে !!?

আর মুসলিম হত্যা করার শাস্তি নিঃসন্দেহে মৃত্যুদন্ড!! যা চুক্তিভঙ্গের জন্য যথেষ্ট!

অতএব, নিঃসন্দেহে মুসলিম হত্যার সাথে সাথে সকল প্রকার শান্তিচুক্তি ভেঙ্গে যাবে। এব্যাপারে পূর্ব-পশ্চিম, পূর্ববর্তি ও পরবর্তী কোনো আলেমের দ্বিমত নেই।

ইরাকের দশ লক্ষাধিক মুসলিম, আফগানিস্তানে পাঁচ লক্ষাধিক, সিরিয়াতে ইতিমধ্যে নিহত মুসলিমের সংখ্যা তিন লাখ ছাড়িয়েছে। ইয়েমেন, মালি ও সোমালিয়াতেও কয়েক সহস্রাধিকের কম নয় এই সংখ্যা। এছাড়াও, কারাগারগুলোতে সহস্রাধিক বোনেরা প্রতিদিন হচ্ছে নির্যাতিত! এসকল হত্যাকান্ডে জড়িত আছে আমেরিকা, nato ভুক্ত ইউরোপের দেশগুলো,

amisom ভুক্ত আফ্রিকার ক্রুসেডার দেশগুলো। এগুলো গোপনীয় কোনো বিষয় নয়। দিনের আলোর মতই প্রকাশ্য বিষয় এগুলো যা ঢাকা পরেছে মূলত বিশ্বাসঘাতক মুরতাদ শাসক ও তাদের কাছে বিক্রীত আলেমদের বিকৃত ফতোয়াবাজির কারণে...

সবচেয়ে বড় কথা আমেরিকা নিজ মুখে স্বীকার করেছে তারা আল মাজালাহতে সাধারণ মুসলিমদের হত্যা করেছে, ইরাকের মাহমুদিয়াতে আমেরিকান পাঁচ সৈন্য মিলে ১৪ বছর বয়সী বালিকাকে গণধর্ষণের পর হত্যা করে গোটা পরিবারসহ! তাও আগুনে পুড়িয়ে...

এরপরও কীভাবে মুসলমানদের সাথে আমেরিকা ও তার সহযোগী কাফের রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি বলবৎ থাকে আমার বুঝে আসে না! এসকল ফতোয়াবাজ আলেমরা কি বিক্রীত নাকি বিকৃত আমি জানি না।

অথচ, মাত্র একজন মুসলিম বোনের সম্ভ্রমহানির সাথে সাথে রাসুল ﷺ চুক্তি ভেঙ্গে বনু কাইনুকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন!! আজ আমাদের চক্ষুর শীতলতা রাসুল (সা) এসকল উলামায়ে ছু'দের দেখলে কী বলতেন, যারা কি না মুসলিম ভাইদের জীবনের, মুসলিম বোনদের সম্মানের কোনো তোয়াক্কাই করে না বরং তাদের উপর কাফিরদের আরও বেশী জুলুম করার সুযোগ করে দেয়ার উদ্দেশ্য ফতোয়া প্রণয়ন করে! আল্লাহু আ'লাম!

এছাড়াও, ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলছেন -

"রাসুল সাঃ'র অনুমতি ছাড়াই কোন একজন সাহাবীর সাথে তাঁর শত্রুরা যদি এমন কোন চুক্তি করত, যাতে মুসলমানদের ক্ষতির কোন আশঙ্কা নেই, তাহলে তিনি সেই চুক্তি ও অঙ্গিকার বহাল রাখতেন। যেমন হুযায়ফা ও তার পিতার সাথে শত্র"রা এই মর্মে চুক্তি ও অঙ্গিকার করেছিল যে, তোমরা দু'জন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে যোগ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবেনা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অঙ্গিকার বহাল রাখলেন এবং হুযায়ফা ও তার পিতাকে বললেনঃ তোমরা ফেরত যাও। তারা তোমাদের সাথে যে অঙ্গিকার করেছে আমরা তা রক্ষা করব। আমরা তাদের মুকাবেলায় কেবল আল্লাহর সাহায্য চাই।" (মুখতাসার জাদুল মা'আদ, পৃষ্ঠা ২০৮)

অর্থাৎ, মুসলিমদের ক্ষতি হলে সেটা চুক্তি কিংবা অঙ্গীকার হিসেবে না থাকলেই কেবল চুক্তি বহাল রাখা হতো অন্যথায় নয়।

আর চুক্তির বিপরীতে মুসলিমদের ক্ষতি হয়ে গেলে চুক্তি বহাল থাকবে কি না এটা শারিয়াহ সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান রাখা ব্যক্তিদের দ্বিধান্বিত হবার কোনো কারণই নেই।

পড়ুন,

ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেন,

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন গোত্রের সাথে চুক্তি করতেন, তখন তাদের সাথে তাঁর অন্যান্য শত্র"রাও শরীক হত। তাঁর সাথেও অন্য কাফেররা এসে যোগ দিত। এতে করে যারা তাঁর সাথে যোগদানকারী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত তাদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে বলেই ধরে নেওয়া হত। এই কারণেই তিনি মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

কেননা হুদায়বিয়ার সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কুরাইশদের মধ্যে দশ বছর পর্যন্ত সকল প্রকার যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। এই চুক্তিতে বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে যোগ দিল। আর খোযাআ গোত্র যোগ দিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে।

পরবর্তীতে বনু বকর গোত্র রাতের অন্ধকারে খুযাআ গোত্রের উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং তাদের কতককে হত্যা করল। কুরাইশরাও গোপনে বনু বকরকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করল। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কুরাইশদেরকে অঙ্গিকার ও চুক্তি ভঙ্গকারী হিসাবে গণনা করলেন এবং বনু বকর ও কুরাইশদের বিরুদ্ধে হামলা করে মক্কা জয় করলেন।" (মুখতাসার জাদুল মা'আদ, পৃষ্ঠা ২০৮)

উক্ত দলীলের আলোকে একথা বলার কি কোনো সুযোগ আছে যে, মুসলমানদের রক্তে হাত রঞ্জিত করা জাতিরাষ্ট্রগুলোর সাথে কোনো চুক্তি এখনো বলবৎ আছে !!! একথা বলা এবং আল্লাহ'র রাসুল সাঃ এর আদর্শকে প্রশ্নবিদ্ধ করা ভিন্ন কিছু নয়।

"কোনো চুক্তিবদ্ধ জাতি লক্ষাধিক মুসলিম হত্যা করার পরও তাদের সাথে সেই চুক্তি বহাল থাকে" - এই ধরণের বক্তব্যকে জায়েজ প্রমাণ করা মুসলিম রক্ত ও সম্মানের

প্রতি গাফেল ব্যক্তিদের প্রতি আহ্বান থাকবে তারা যেন এর স্বপক্ষে মাত্র ১টি দলিল পেশ করে কুর'আন, সুন্নাহ ও সালাফদের বক্তব্যের আলোকে।

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। [সুরা নাম'ল: ৬৪]

তাই যদি, মুরতাদ শাসকদেরকে মুসলিম ধরেও নেয়া হয় তবু, আমেরিকা, nato, amisom ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক কুফর সংঘের অন্তর্ভুক্ত যে সকল ক্বওম/জাতি/রাষ্ট্র মুসলিম নিধনে ব্যস্ত তাদের সাথে কোনো বৈধ শান্তিচুক্তি হয়েও থাকে তবু তা বহু আগেই বাতিল হয়ে গেছে... !

দ্বিতীয়ত, যদি চুক্তি ভঙ্গ হয় তাহলে শুধুমাত্র যারা মুসলিম নিধনে ব্যস্ত তাদের সাথেই কেবল যুদ্ধ জায়েজ হওয়ার কথা। সেই জাতির নিরীহ/সাধারণ নাগরিকদের হত্যা করা কেন বৈধ হবে?

এমনটা শুধু জায়েজ/বৈধ নয়, বরং এটি রাসুলুল্লাহ (সা) এর সুন্নাহ...

ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেন,

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র সুন্নাত এই ছিল যে, তিনি যখন কোন গোত্রের সাথে চুক্তি করতেন, তখন তাদের কতক লোক যদি সেই চুক্তি ভঙ্গ করত আর কতক লোক সেই চুক্তি বহাল রাখত এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকত, তাহলে সকলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতেন।

যেমন তিনি করেছিলেন বনী কুরায়যা, বনী নযীর এবং মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে। এই ছিল চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের বিরুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র সুন্নাত।" (মুখতাসার জাদুল মা'আদ, পৃষ্ঠা ২০৮)

অর্থাৎ, যদি আমরা ধরে নেই আমেরিকা ও অন্যান্য যুদ্ধরত কাফের রাষ্ট্রের (ন্যাটো, আমিসোম ভুক্ত দেশসমূহ, ফ্রান্স ইত্যাদি) কয়েক লক্ষাধিক সৈন্য, আমেরিকার প্রশাসন ও নীতিনির্ধারকেরাই চুক্তি ভঙ্গ করেছে। এসব জাতির সাধারণ নাগরিকেরা চুক্তি ভাঙ্গেনি।

যদি আরও ধরে নেই যে, এসব জাতির নাগরিকেরা চুক্তিভঙ্গের বিরোধিতাকারী(!?)।
তবুও রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নাহ হচ্ছে এদের সকলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা!

আরও পড়ুন, ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেন,

"যখন সিরিয়ার খৃষ্টানরা মুসলমানদের সম্পদ ও বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিল, তখন অন্যান্য খৃষ্টানরা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েও মুসলিম শাসককে জানায়নি। কিন্তু শাসক বিষয়টি জানতে পেরে আলেমদের কাছে যখন ফতোয়া চাইলেন,

তখন আমরা ঐ খেয়ানতকারীদের ব্যাপারে শাসককে ফতোয়া দিলাম যে, যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে, যারা এতে সহায়তা করেছে এবং যারা এতে সন্তুষ্ট হয়েছে এদের সকলকেই হত্যা করতে হবে।

এদের ব্যাপারটি শাসকের ইচ্ছাধীন নয়, হত্যাই একমাত্র তাদের শাস্তি।" (মুখতাসার জাদুল মা'আদ, পৃষ্ঠা ২০৯)

অর্থাৎ, - মুসলিমদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষাবলম্বন না করাকেই আলেমরা বসে থাকা "নিরীহ" খ্রিস্টানদের জন্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন এবং এদেরকে হত্যা করা বাধ্যতামুলক উল্লেখ করে আরও বলেছেন এটা শাসকের ইচ্ছাধীন নয়।

জরিমানা আদায় কিংবা বন্দী করা নয়, হত্যাই তাদের একমাত্র শাস্তি।

অতএব, এই যদি হয় মুসলিমদের সম্পদ নস্টকারী ও বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া চুক্তিবদ্ধ কাফির জাতির (সিরিয়ার খ্রিস্টান গোষ্ঠী) পরিণতি, তাহলে আমেরিকা ও তার ক্রুসেডার মিত্র রাষ্ট্রসমূহ যারা মুসলিমদের সম্পদ নস্ট ও বাড়িঘর জালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং, মুসলমান ভাইদের নির্বিচারে হত্যা করছে, মুসলমান বোনদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে তাদের একমাত্র পরিণতি কী হবে ??

মুসলমানের রক্ত মুখে লাগিয়ে রাখা মুসলিম নামধারী নিফাকাক্রান্ত, বিকৃতমনা জ্ঞানপাপীদের ফিতনা থেকে আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন... আমিন...

إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ

"যখন আমরা কোন সম্প্রদায়ের নিকট পৌছি যুদ্ধের জন্য, এটি তাদের জন্য দুর্বিষহ সকাল যাদেরকে পূর্বে সতর্ক করা হয়েছিল।"

(সঃ)হিহ বুখারি, ৩৭১)

পোস্টের লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪৭২০

লুতফুর রহমান ফরাজি ও "আহলে হক কর্তৃক সৃষ্ট সংশয়ের জবাব-১

প্রশ্ন - দারুল হরব কাকে বলে? বাংলাদেশ কি দারুল হারব?

umar mukhtar

Senior Member

০৯-২৭-২০১৬

.#উত্তর – বাংলাদেশের জিহাদ ও শারীয়াহর দাওয়াহ যতোই প্রসার পাচ্ছে, বাংলাদেশে ইসলামবিদ্বেষী ও ইসলামবিরোধীদের আস্ফালন যতোই বৃদ্ধি পাচ্ছে ততোই এক শ্রেণীর ইরজাগ্রস্থ ব্যক্তিদের চিৎকার চেচামেচিও বৃদ্ধি পাচ্ছে যারা এমন এক ইসলাম আমাদের শেখাতে চায় যা শাসক বান্ধব, কাফির বান্ধব, মুশরিক বান্ধব। এরা জাতিকে এক নখ-দন্তহীন এক মডিফাইড ইসলাম শেখাতে চায়। পদাবনত, নতমস্তক, নতজানু হবার এক ফিক্বহ এরা আমাদের শেখাতে চায়। এরা আমাদের শেখাতে চায় এ Civil Democractic Islam যা শাসকদের মনরক্ষা করে চলে আর তাওহীদের ব্যাপারে আপোষ করে।

কে বিভিন্ন মাসলাকের আড়াল, বিভিন্ন তকমা লাগিয়ে সহীহ আর হক্বানি লেবেল লাগিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে শাসকের প্রিয় এই Civil Democratic Islam - এই ইরজার আদর্শ প্রচার করা হয়। একদল এটা করে হাদিস ও সালাফ আস সালেহিনের বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে। আরেক দল এটা করে ফিক্বহের – স্পষ্ট করে বলল ফিক্বহে হানাফির ভুল উপস্থাপন ও কুযুক্তি ও তর্কের মাধ্যমে।

আর তাই ওলামায়ে নাজদের অনুসারী দাবিকারীরা তাগুতের সংজ্ঞা ভুলে যায়, শাহ আব্দুল আযিয রাহিমাহুল্লাহর পথের অনুসারীর হবার দাবিদাররা দারুল হারব আর দারুল ইসলামের সংজ্ঞায় তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। ইনিয়ে বিনিয়ে অজুহাত আর ছুতো খুজে বাংলাদেশে বর্তমানে চলতে থাকা ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসন ও শাসনকে ইসলাম ও মুসলিম বান্ধব বলে চালিয়ে দিতে চান।

সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখিত ধারাগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় ধারার একটি বক্তব্য লুতফর ফরায়েজী নামক একজন ‘আলিম” ও “আহলে হক্ব” মিডিয়া নামক একটি

প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যাপক ভাবে প্রচার করছে। এই ব্যক্তি শুধু বাংলাদেশ না ভারত, ইউরোপ, অ্যামেরিকা, সব জায়গাকে দারুল আমান দাবি করে সেখানে জিহাদ জায়েজ না এমন উল্লেখ করে বসে আছেন। নিজের এই অসমর্থনযোগ্য অবস্থানের সমর্থনে হাজির করছেন নানা শিশুসুলভ হাস্যকর যুক্তি, ব্যবহার করছেন অপবাদ দেবার মাধ্যমে মূল বিষয় থেকে মনোযোগ সরানোর কৌশল।

যদি আল্লাহ চান তাহলে তার এসব "যুক্তি" নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনার ইচ্ছা রাখি কিন্তু তার আগে দারুল হারব ও দারুল ইসলামের ব্যাপারে হানাফি ফিক্বহ ও উলামায়ে দেওবন্দের বক্তব্যের আলোকে একজন মুহাদ্দিসের আলোচনা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই, যেখানে ফুটে উঠেছে বিভিন্ন দার-এর সংজ্ঞা এবং বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে পূর্ববর্তীদের অবস্থানের আলোকে বিশ্লেষণ। আশা করি সত্যান্বেষীদের জন্য এই আলোচনা সহায়ক হবে-

'দারুল হরব' এর পরিচয়

১। **الموسوعة الفقهية الكويتية** তে বলা হয়েছে:

دار الحرب هي كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة

দারুল হরব এমন ভুমি যেখানে কুফুরী শাষন বিজয়ী থাকে।

২। ফাতওয়ায়ে মাহমূদিয়াতে বলা হয়েছে: খ:২০ পৃ:৩৬৬

دار الحرب وہ ہے کہ جو مقام ایسا ہو کہ وہاں اہل شرك کے احکام جاري ہو اور اسکی آس پاس متصل مقامات کا حال بھي ایسا ہي ہو اور وہاں کوئي مسلمان اپنے اسلام کي بنا پر مأمون نہ ہو وہ دار الحرب ہے۔

দারুল হরব এমন রাষ্ট্রকে বলে যেখানে কাফেরদের বিধান কার্যকর থাকে এবং তার আশপাশের অঞ্চলগুলোও এমনই এবং সেখানে কোন মুসলমান ইসলামের বলে বলীয়ান ও নিরাপদ নয়।

৩। **جامع الرموز** গ্রন্থে বলা হয়েছে:

دار الإسلام ما يجري فيه حكم إمام المسلمين وكانوا فيه آمنين ودار الحرب ما خافوا فيه من الكافرين.

দারুল ইসলাম সে রাষ্ট্রকে বলে যেখানে মুসলমানদের মুসলিম শাসকের হুকুম বলবৎ থাকে এবং মুসলমানগণ সেখানে নিরাপদ। আর দারুল হরব সে রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানগণ কাফেরদের কারণে জান মালের ক্ষতির আশংকা করে।

দারুল হরবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানের পর এখানে আমরা ফকীহুন নফস রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর ফতোয়ার কিছু আলোচনা পেশ করতে পারি।

হযরত বলেন, " শোন! কোন শহর বা রাষ্ট্র দারুল হরব বা দারুল ইসলাম হবার ভিত্তি হল ক্ষমতা ও শক্তির উপর। ক্ষমতা ও শক্তি কাফেরদের হাতে না মুসলমানদের হাতে। বাস এতটুকুই। তাই যে সকল স্থান মুসলমানদের বিধি বিধানের অধীন তা দারুল ইসলাম আর যা কাফেরদের বিধি বিধানের অধীন তা দারুর হরব। পূর্বোক্ত সংজ্ঞা সমূহ থেকেও এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে।"

যখন এ মাসআলার ভিত্তিই হলো ক্ষমতা ও শক্তি তাই কোন অঞ্চলে শুধু মুসলমানদের বসবাসের কারণে কিংবা কাফরদের অনুমতি নিয়ে কিছু শা'আইরে ইসলাম পালনের কারণে (যেমন জুমা, ঈদ, মসজিদ, মাদরাসা, খানকা, তাবলীগ জামাতের কার্যাদী দ্বীনী মাহফিল সমূহ ইত্যাদি) তা দারুল ইসলাম হবে না। অনুরূপ কোন ভূখন্ডের উপর যদি মুসলমানদের ক্ষমতা থাকে তাহলে সেটা দারুল ইসলাম। যদিও তার অধিকাংশ অধিবাসীই কাফের হয় এবং মুসলিম শাসকের অনুমতিতে তাদের ধর্মীয় কার্যক্রম খোলাখুলিভাবে পালন করে।

বিষয়টি বাস্তব উদাহরন দিয়ে বুঝুন।

১. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম হিজরীতে ওমরাতুল কাযার জন্য এক বিশাল জামাত নিয়ে কাফেরদের অনুমতিতে মক্কায় প্রবেশ করেন। তিন দিন সেখানে অবস্থান করেন। এই তিন দিনে প্রকাশে ওমরা পালন, জামাতে নামায আদায় ও অন্যান্য ইবাদত সবই পালন করেছেন। কিন্তু মুসলমানদের এই বিশাল সংখ্যা ও প্রকাশ্য ইবাদতের কারণে এ তিন দিন মক্কা দারুল ইসলাম হয়ে যায়নি। বরং আগে যেমন দারুল হরব ছিল ঐ সময়ও দারুল হরবই থেকেছে।

২. মদীনায় রাষ্ট্র গঠণের পর প্রথম কয়েক বছর সেখানে ইহুদীদের তিন তিনটি গোত্র ছিল। তাদের এলাকা সমূহে তারা আপন ধর্ম পালন করত। তাদের সংখ্যাও কম ছিল না। কিন্তু ক্ষমতার বাগডোর যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে ছিল তাই ইহুদীদের এলাকাগুলোও দারুল ইসলাম ছিল। কেউ তাকে দারুল হরব বলেনি।

باقيات فتاوى رشيديه ص: ৪৯৭-৪৯৮

এটাতো হল প্রথম থেকেই কোন্ অঞ্চল দারুল ইসলাম আর কোনটা দারুল হরব তা চিহ্নিত করার উপায়। এবার আসুন জেনে নেই, যে অঞ্চল দারুল ইসলাম ছিল তা কখন দারুল হরবে পরিণত হয়।

ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া/আলমগীরীর খ:২ পৃ:২৪৮ (দারুল ফিকর বৈরুত) এতে বলা হয়েছে:

قال محمد رحمه الله في الزيادات : إنما تصير دار الإسلام دار الحرب عند أبي حنيفة رح بشروط ثلاثة: أحدها: إجراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهار، وأن لا يحكم فيها بأحكام الإسلام . الثاني: أن تكون متصلة بدار الحرب ، لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام . الثالث: أن لا يبقى فيها مؤمن ولا ذمي آمنا بأمانه الأول الذي كان ثابتا قبل استيلاء الكفار ، للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة . ..... وقال أبو يوسف ومحمد رح بشرط واحد لا غير، وهو إظهار أحكام الكفر.

ইমাম মুহাম্মদ রঃ তার 'যিয়াদাত' কিতাবে বলেন, আবূ হানীফা রঃ এর মতে দারুল ইসলাম তিন শর্তে দারুল হরব হয়।

১. খোলাখুলিভাবে কাফেরদের আহকাম বাস্তবায়ন।

২. দারুল হরবের সাথে মিলে থাকা তথা উক্ত অঞ্চল ও দারুল হরবের মাঝে কোন দারুল ইসলাম না থাকা।

৩. এখানে বসবাসরত মু'মিন ও যিম্মীদের পূর্বে অর্জিত আমান উঠে যাওয়া যা তারা মুসলিম শাসক থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল।

আর সাহেবাইন ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান (রাহিমাহুমুল্লাহ) এর মতে শুধু এক শর্তই যথেষ্ট, তা হলো কুফুরী শাসন বাস্তবায়ন করা।

জামিউর রুমূয গ্রন্থেও অনুরূপ কথাই বলা হয়েছে। আদ দুররুল মুখতারের ইবারতও এমনই। এই উক্তিগুলো ফাতাওয়ায়ে আযীযী পৃ: ৫৮৩ ও ৪৫৪ তে উল্লেখ করা হয়েছে। বাদায়েউস সানায়ে কিতাবের ভাষ্যও এরকম।

এখন আমাদের জানতে হবে **إجراء أحكام الكفر** এর কী অর্থ এবং আবূ হানীফা রঃ এর শর্তগুলোর বাস্তবতা কী।

শরহুয যিয়াদাত কিতাবে কাযী খান রঃ -মৃত ৫৯২হিঃ- ইমাম মুহাম্মদের উপরোক্ত ক্বাওলের ব্যাখ্যায় বলেন,

إن الدار إنما تنسب إلى أهلها باعتبار الولاية واليد ، وإجراء الأحكام يدل على الولاية ، فتثبت النسبة.

কোন অঞ্চল তার অধিবাসীদের দিকে নিসবাত করা হয় ক্ষমতা এবং শক্তির ভিত্তিতে। আহকাম বাস্তবায়ন করা এটা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে বুঝায়। তাই এর দ্বারাই নিসবাত সাব্যস্ত হবে। (অর্থাৎ ক্ষমতা কাফেরদের হলে দারুল হরব, অন্যথায় দারুল ইসলাম।)

রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রঃ আরো সাফ করে বলেন,

كيونكه اجرائے احكام سے شوكت وغلبه مراد هے نه سركاري ملازمين وحكام كي اجازت سى مراسيم دين كي ادائيگي۔ باقيات فتاوى رشيديه ص٥٠٣

অর্থাৎ জুমু'আ, ঈদ, জামাতসহ অন্যান্য শা'আইরে ইসলাম পালন করা না করার দ্বারা কিছু যায় আসে না। কেননা **إجراء احكام** দ্বারা উদ্দেশ্যই হলো শাওকত ও গালাবা। সরকারি কর্মকর্তা এবং শাসকদের অনুমতি নিয়ে ইসলামের বিধি-নিষেধ পালন করতে পারলে এই হুকুমের মাঝে কোন পার্থক্য আসবে না। - ফাতাওয়ায়ে আযীযী পৃ:৪৫৫

কোন এলাকা যদি এমন হয় যে, সেখানে কাফেরদের পূর্ণ দখলদারিত্ব পাওয়া গেছে। মুসলমানদের ক্ষমতা একেবারে শেষ হয়ে গেছে এতদসত্ত্বেও কাফেররা ঐ

অঞ্চলে তাদের একটিও কুফুরী আইন বাস্তাবায়ন করেনি, বরং ঐ অঞ্চলেরই কোন একজন মুসলমানকে শাসক বানিয়ে বলে দিল, তুমি তোমার ধর্মের নিয়মানুযায়ী শাসনকার্য চালিয়ে যাও তবে ক্ষমতা আমাদের হাতে থাকবে।

যেমন ১৯৩৫ সালে ভারত শাসনের ক্ষেত্রে ইংরেজরা এক নতুন প্রক্রিয়া চালু করে। যার নাম দেয়া হয় ''ইন্ডিয়ান এ্যাক্ট"। এই এ্যাক্ট এর সার কথা ছিল, প্রদেশ ভিত্তিক নির্বাচন হবে। এই নির্বাচনে মুসলিম প্রদেশ গুলোতে মুসলিম গভর্ণর নির্বাচিত হবেন। হাতে গোনা কয়েকটি বিভাগ যেমন পররাষ্ট্র বিভাগ, স্বরাষ্ট্র বিভাগ, প্রচার বিভাগ ও যোগাযোগ বিভাগ এগুলো ইংরেজদের নিয়ন্ত্রনে থাকবে। এছাড়া অন্যান্য সকল বিভাগ প্রাদেশিক সরকারের ও কেন্দ্রের হাতে ন্যাস্ত থাকবে।

উল্লিখিত সুরতেও ঐ অঞ্চল দারুল হরবই থাকবে। মূল ক্ষমতা কাফেরদের হাতে থাকার কারণে।

এখানে আমরা বারবার একটি কথাই বোঝানোর চেষ্টা করছি যে, শাসন কার চলে না চলে আমরা ইসলামী আহকামগুলো পালন করতে পারি কি না, এর সাথে হুকুমের কোন সম্পর্ক নেই। বরং মূল বিষয় হলো, ক্ষমতা কার হাতে। ব্যাস। (ফোকাহায়ে কেরাম এ কথাটিই বুঝাতে চেয়েছেন) (বাকিয়াত পৃ:৫০১)

আমরা একটু আগে বলে এসেছি যে, যে অঞ্চলে কাফেরদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর মুসলমানদের ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে।

এই ২য় কথাটির অর্থ আমাদের বুঝতে হবে। কেননা এর মাধ্যমে আবূ হানীফা ও সাহেবাইনের মাঝে এখতেলাফের কারণ এবং আবূ হানীফা রঃ এর অতিরিক্ত শর্ত সমূহের বাস্তবতা বুঝে আসবে।

প্রথমে রশীদ আহমদ গাঙ্গহী রঃ এর কথা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে, হযরত বলেন,

مگر غلبه اقتدار بالکل ختم هونے کي کیا حد هے اس میں همارے ائمه فقه کے درمیان اختلاف هے ۔ صاحبین فرماتے هیں.....

ক্ষমতা একেবারে নিঃশেষ হবার সীমা কতটুকু এ নিয়ে আমাদের ইমামগণের মাঝে এখতেলাফ রয়েছে।

সাহেবাইন বলেন, কাফের মুসলিম উভয় দলই যদি নিজেদের ক্ষমতা, নিজেদের বিধান, বিচার আচার গুলো কার্যকর করতে পারে তাহলে বুঝা যাবে মুসলমানদের ক্ষমতা এখনো শেষ হয়নি। তখন **الإسلام يعلو ولا يُعلى** এর কায়েদা মত এটাকে দারুল ইসলামই ধরা হবে। কিন্তু যদি এর জন্য মুসলমানরা কাফেরদের থেকে অনুমতি নিতে হয় (যদিও তা মৌন সমর্থনই হোকনা কেন, অর্থাৎ মুসলমানরা তাদের হুকুমগুলো পালন করে যাচ্ছে কিন্তু কাফেররা বাধা দেবার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও বাধা দিচ্ছে না) তাহলে ধরা হবে এখানে মুসলমানদের আর কোন ক্ষমতা বাকী রইল না।

আর আবূ হানীফা রঃ সূক্ষ্ম দৃষ্টির কারণে **استحسانًا** এই মত পোষণ করেছেন যে, কোন দারুল ইসলামকে দারুল হরব ঘোষণা দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। তাই যতক্ষন পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে ইসলামী গালাবার নিশানাসমূহ হতে সামান্য নিশানাও বাকী থাকে এবং কাফেরদের ক্ষমতা বিস্তারের মধ্যে একটুও দূর্বলতা পাওয়া যায় ততক্ষন তাকে দারুল হরব ঘোষণা দেয়া হবে না।

অতিরিক্ত শর্তদ্বয়ের প্রথম শর্ত, মাঝখানে কোন দারুল ইসলাম থাকা এটা কাফেরদের ক্ষমতা বিস্তারের পথে এক ধরণের বাধা। কারণ যে যেকোন সময় পার্শ্বস্থ দারুল ইসলামের লোকেরা হামলা চালিয়ে অত্র অঞ্চল কাফেরদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে।

অধিকন্তু হযরত বলেছেন, এ শর্তটির সম্পর্ক ছোট ছোট বসতী ও শহরের সাথে। কোন রাষ্ট্র বা বড় এলাকার জন্য এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না। (বাকিয়াত পৃ: ৫০৪)

আর ২য় শর্ত তথা মুসলিম শাসক থেকে অর্জিত আমান বাকি থাকা। এর দ্বারাও উদ্দেশ্য হলো মুসলিম শাসকের ক্ষমত বাকি থাকা। কারণ এই আমানের হাকীকত হল মুসলিম শাসকের ভয়ে এসে অপরের অনিষ্টসাধন থেকে বিরত থাকা। শাসক ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে তো এই ভয় বাকী থাকার প্রশ্নই আসে না।

উক্ত বিষয়টি 'শরহুয যিয়াদাত' কিতাবে আরো গোছালো ভাবে বলা হয়েছে। খ:৬ পৃ:২০২৩

ولأبي حنيفة رح ان الدار إنما تنسب إلى أهل الحرب عند ظهور قدرة أهل الحرب وغلبتهم وقوتهم ولا تظهر إلا عند وجود هذه الشرائط كلها ، أما عند عدم بعضها كانت الدلائل في حد التعارض.....

আহলে হারবের দিকে রাষ্ট্রর নিসবাত তাদের ক্ষমতা ও শক্তির ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। আর এই সবগুলো শর্ত পাওয়া গেলেই তাদের ক্ষমতাটা সুস্পষ্ট হয়। কোন একটা শর্ত অনুপস্থিত হলে দলীলের মধ্রে বিরোধ দেখা দেয় (বিধায় তাদের গালাবার নিশ্চয়তা লাভের জন্য এ শর্তগুলো প্রয়োগ করা হয়।)

এ বিষয়টি হুবহু ঐ হাদীসের মতই যেখানে বলা হয়েছে তোমাদের কারো যদি পেছনের রাস্তায় কিছু বের হবার অনুভুতি হয় তাহলে আওয়াজ শোনা অথবা দুর্গন্ধ পাওয়া ব্যতীত নামায ছাড়বেনা। এই হাদিসে আওয়াজ শোনা ও দুর্গন্ধ পাওয়ার শর্ত শুধুমাত্র নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে তার বাতাস বের হয়েছে। অন্যথায় যদি কেউ এ দুটি ছাড়াও নিশ্চিত হয়ে যায় তবে তার জন্য নামায জারি রাখা বৈধ হবে না।

কাফেরের গালাবা হলে দারুল ইসলাম দারুল হরব হয়ে যায়। এটা কি শুধু ভিনদেশী কাফেরের হামলার মাঝেই সীমাবদ্ধ না এর আরো সুরত রয়েছে ?

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে খ:২ পৃ:২৪৮ বলা হয়েছে:

وصورة المسئلة على ثلاثة أوجه ، إما أن يغلب أهل الحرب على دار من دورنا أو ارتدّ أهل مصر وغلبوا وأجروا أحكام الكفر أو نقض أهل الذمة العهد وتغلبوا على دارهم.

দারুল ইসলাম দারুল হরবে পরিণত হওয়ার তিনটি সূরত রয়েছে:

১. ভিনদেশী আহলে হরব আমাদের কোন দারুল ইসলামে হামলা করে তাতে ক্ষমতা বিস্তার করল।

২. কোন শহরবাসী মুরতাদ হয়ে ঐ শহরের ক্ষমতা দখল করল এবং তাতে কুফুরী শাসন বাস্তবায়ন করল।

৩. যিম্মীরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে শহরের ক্ষমতা দখল করল।

এই তিন সুরতের যে কোন এক সুরত পাওয়া গেলেই সে অঞ্চল দারুল হরবে পরিণত হবে।

আমভাবে দারুল হরবের পরিচয় লাভের পর এবার আমরা বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান নিয়ে একটু পর্যালোচনা করে দেখি:

কেউ কি এই দুঃসাহস দেখাতে পারবে যে বলবে ''বাংলাদেশে ইসলামী শাসন চালু আছে।"
এটা একটা স্পষ্ট ও চাক্ষুস বিষয় যে বাংলাদেশের সংবিধান হল কুফুরী সংবিধান। এতে যদি কারো সংশয় থাকে তাহলে ইসলামের মৌলিক বিষয়ে যে জ্ঞান রাখে সে যেন একটু কষ্ট করে বাংলাদেশের সংবিধানটা আদ্যোপান্ত পড়ে নেয়।

বিশেষ করে অনুচ্ছেদ সাতের ধারা এক ও দুই, অনুচ্ছেদ ৬৫ এর ধারা ১,

অনুচ্ছেদ ৭৫ এর ধারা ১ এর খ, অনুচ্ছেদ ৮০ এর ধারা ১,২,৩,৪,৫ অনুচ্ছেদ ৪৮ এর ধারা ২, অনুচ্ছেদ ৫৯ এর ধারা ১, অনুচ্ছেদ ৫৮ এর ধারা ২, অনুচ্ছেদ ৫৫ এর ধারা ২, অনুচ্ছেদ ১৪২ এর ধারা ১, অনুচ্ছেদ ২৮ এর ধারা ১,২ অনুচ্ছেদ ২৬ এর ধারা ১,২ অনুচ্ছেদ ২৯ এর ধারা ১,২ অনুচ্ছেদ ৩৯ এর ধারা ১,২ক অনুচ্ছেদ ৩২ এবং ৪৯। এখানে সহজের জন্য কিছু অনুচ্ছেদ ও ধারার কথা উল্লেখ করলাম। তবে পুরা সংবিধান পড়ে নিলে আরো সাফ হবে।

যখন এদেশে শাসনও কুফুরী অথচ ফোকাহায়ে কেরাম দারুল ইসলামের পরিচয় দিতে গিয়ে সবাই উল্লেখ করেছেন, যেখানে **إجراء أحكام الإسلام** পাওয়া যায় তাই দারুল ইসলাম। যেমন আমরা শুরুতে **جامع الرموز** এর ইবারতে উল্লেখ করেছি।

কেউ বলবেন, আপনিই না বলেছেন, **إجراء أحكام الإسلام** দ্বারা **غلبة المسلمين** উদ্দেশ্য, হুকুম চলুক বা না চলুক এর উপর মাসআলার ভিত্তি নয়। হ্যা, আমরা বলেছি, এখানেও আমি সরাসরি এ কথাটা দিয়ে শুরু করতে পারতাম। কিন্তু আলোচনার সকল দিক বুঝে আসার জন্য আমরা একটু দূর থেকে আসলাম। আসলেই মূল উদ্দেশ্য হল অঞ্চলটা কাদের ক্ষমতাধীন।

যেমনটা আমরা পূর্বে বিশদ আলোচনা করেছি এবং আল্লামা সারাখসী রঃ ও শরহুস সিয়ারিল কাবীরের মধ্যে সাফ করে বলেছেন,

فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين.

দারুল ইসলাম এমন ভূমীকেই বলে যা মুসলমানদের ক্ষমতাধীন থাকে। (চাই তারা সেখানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করুক বা না করুক।)

এবার আমাদের সমাধানে পৌছতে হলে ক্ষমতাসীনদের দিকে তাকাতে হবে। এই ক্ষমতাসনিদের শরঈ হুকুম যদি আমরা সঠিকভাবে বুঝতে না পারি তাহলে এতক্ষনের এ দীর্ঘ আলোচনা সবই পন্ড ও অর্থহীন। তবে আলোচনার বিস্তৃতি অনেক বেড়ে যাওয়ায় আমরা এখানে শুধু ক্ষমতাসীনদের হুকুম আলোচনা করে সমাধানে পৌছতে চাই।

আমাদের বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীসহ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী অন্যান্য সংসদ সদস্য মুরতাদ। সে মতে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে বর্ণিত দারুল হরব হবার তিন সুরতের ২য় সুরত এখানে পাওয়া যাওয়ার ভিত্তিতে বাংলাদেশ বর্তমানে দারুল হরব।
সবশেষে আমরা এ দাবী সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী করনের নিমিত্তে সামান্য কিছু দালিলিক আলোচনা করবো।

১. মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী রঃ কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, হযরত! ইংরেজদের যামানায় হিন্দুস্তান আপনাদের মতে দারুল হরব ছিল কি ? ইংরেজদের পর বর্তমান সময়ে আগের হুকুমে কোন পার্থক্য এসেছে কি ?

হযরত জবাবে বললেন, হ্যা আমাদের মতে হিন্দুস্তান দারুল হরব ছিল ঐ সকল দলীলের ভিত্তিতে যা হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রঃ ও শাহ আব্দুল আযীয রঃ লিখে গেছেন। বর্তমান যমানায়ও হিন্দুস্তান দারুল হরব। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কারণে তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়নি। (ফাতাওয়ায়ে মাহমূদীয়া খ:২০ পৃ:৩৬০)
এখানে হযরতের সর্বশেষ বাক্যটি লক্ষ্যনীয়। কারণ অনেকের সংশয় হতে পারে যে, হযরতকে তো হিন্দুস্তান তথা বর্তমান ভারতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। ভারত যেহেতু হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ তাই দারুল হরব হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদেরর বাংলাদেশে তো সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান। আমরা বলবো, আপরি হযরতের শেষ বাক্যটি আরেকবার পড়ে দেখুন। গণতন্ত্র এটা এমন এক শাসন

ব্যবস্থা যা ধর্ম বিভেদ, রাষ্ট্র বিভেদ ও পরিবেশ বিভেদে এর মূল কাঠামোতে কোন পরিবর্তন আসে না। জনৈক রাষ্ট্র বিজ্ঞানীর ভাষায় ''গণতন্ত্র এমন এক সর্বগ্রাসী মতবাদ যা তার পূর্বের পৃথিবীর সকল ধর্ম, মতবাদ ও বিশ্বাসকে হজম করে ফেলেছে।

২. আহসানুল ফাতাওয়ায় খ:৬ পৃ:২১ হযরত রশীদ আহমদ লুধীয়ানবী রঃ বলেন,

جس ملك ميں اگر چه عملا احكام اسلام كا نفاذ نه هو مگر تنفيذ احكام پر قدرت هو وه دار الاسلام هے۔

কোন দেশে যদিও কার্য্যত ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত নয় কিন্তু প্রতিষ্ঠা করার সামর্থ রয়েছে (তথা ইসলামী সরকারের হাতে ক্ষমতা যে কোন মুহূর্তে চাইলেই সে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে) তাহলে তা দারুল ইসলাম।

আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন,

جهاں احكام اسلام كي تنفيذ پر قدرت نه هو وه دار الحرب هے۔

কিন্তু যেখানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার শক্তি নেই তা দারুল হরব। অনুরূপ কথা হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীও বলেছেন। (বাকীযাত পৃ: ৫০৪)

আমরা একটু বাস্তব অবস্থার দিকে তাকাই। আমাদের দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পথে সবচে' বড় বাধা হলো এই মুরতাদ শাসকগোষ্ঠি। আর জনগণ কি এই অবস্থানে রয়েছে যে, যে কোন মুহূর্তে চাইলেই তারা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এমন বাস্তব বিরোধী কথা বা মনোভাব কে পোষণ করতে পারে।

যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত নয় খালেছ একটি দ্বীনী দাবী তথা নাস্তিকদের শাস্তি প্রদানের দাবীতে গণতন্ত্র স্বীকৃত আন্দোলন করেও যে শত শত লাশ গুনতে হয় সেখানে যারা এমন মনোভাব পোষণ করে তাদের ব্যাপারে আমরা অধমরা আর কী বলতে পারি। অথচ সমকালিন প্রসিদ্ধ আলেমদের কয়েকজন এরকম মনোভাব থেকেই মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোকে দারুল ইসলাম ফতোয়া দিয়েছেন।

দলীল স্বরূপ তারা শামীর এবারত নকল করেছেন:

وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض البلاد التابعة كلها دار إسلام، لانها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دينهم وبعضهم يعلنون بشتم الاسلام والمسلمين، لكنهم تحت حكم ولاة أمورنا، وبلاد الاسلام محيطة ببلادهم من كل جانب وإذا أراد ولي الامر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها.

অনুবাদ: এর দ্বারা এ বিষয়টি সুস্প হল যে, শামে জাবালে তাইমুল্লাহ নামে যে অঞ্চল রয়েছে যাকে অন্য নামে জাবালুদ দুরুজও বলা হয় সেসব এলাকা ও তার অধীনস্থ এলাকা সমূহ সব দারুল ইসলাম। কেননা ঐ সকল এলাকায় যদিও খৃস্টান ও দুরুজী শাসকরা বিদ্যমান এবং এমন বিচারক রয়েছে যারা তাদের ধর্ম অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করে এমনকি তাদের কতক ইসলাম ও মুসলামনদের প্রকাশ্যে গালি দেয়। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও তারা যেহেতু আমাদের মুসলিম শাসকদের হুকুমের অধীন এবং তাদের এই অঞ্চলগুলো চতুর্দিক থেকে দারুল ইসলাম দ্বারা বেষ্টিত এবং আমাদের মুসলিম শাসক যখনই ইচ্ছা করে ঐ অঞ্চরগুলোতে আমাদের ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। (তাই এই তিন কারণে ঐ অঞ্চলগুলোর উপর দারুল হরবের হুকুম আরোপ করা হবে না।)

আমরা আমাদের বাংলাদেশের অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখি, যেই তিনটি বিষয় পাওয়া যাওয়ার কারণে শামের ঐ অঞ্চলগুলোকে দারুল ইসলাম বলা হয়েছে তার কোন একটাও আমাদের দেশের বেলায় পাওয়া যায় কি না।

৩. বনী ইয়ারবু' নামক আরবের এক অঞ্চলকে হযরত সিদ্দীকে আকবরের যুগে দারুল হরব ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অথচ সেখানে জুমা, ঈদ ও আযান বহাল ছিল। সে অঞ্চলের মানুষ শুধু যাকাত অস্বীকার করেছিল। (জামেউল ফাতাওয়া খ:৮ পৃ:৩২২)

সব আদায় করে শুধু যাকাত অস্বীকারের কারণে যদি সে অঞ্চল দারুল হরব ঘোষিত হয় তাহলে আইন করে, ক্ষমতা বলে যারা মদের হারাম, যিনার হারাম,

সুদের হারাম হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করে, ফরয নামায, রোযা ও যাকাতকে যারা ফরযের স্তর থেকে নামিয়ে রাষ্ট্রিয় ভাবে শুধু বৈধ রেখেছে।

বাক স্বাধীনতার নামে নবী-রাসূল, আল্লাহ ও শা'আইরে ইসলাম নিয়ে ব্যাঙ্গ করার বৈধতা দিয়েছে, তাদের নিরাপত্তার জন্য হাজার হাজার বাহিনী মোতায়েন করেছে। তাদের ক্ষমতাসীন দেশ যদি দারুল হরব না হয় তাহলে কোরআন, হাদীস, সীরাতসহ ইসলামের সকল পরিভাষার কোন সঠিক প্রয়োগক্ষেত্র থাকে বলে আমার বুঝে আসে না।

সারকথা: দারুল হরব হলো, যেখানে কাফেরের ক্ষমতা বিরাজমান থাকে এবং ইসলামের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়। এর হদ্দ ও মাপকাঠি কী তা নিয়ে ওলামায়ে আহনাফের মাঝে এখতেলাফ। সাহেবাইনের মতে শুধু কুফুরী শাসন প্রতিষ্ঠ করাই যথেষ্ট। আবূ হানীফা রঃ সতর্কতাবশতঃ আরো দুই শর্ত আরোপ করেন। তবে সকলের উদ্দেশ্য একই। বাংলাদেশ ও এ জাতিয় অন্যান্য মুসলিম দেশ (অধিকাংশগুলোই) দারুল হরব, শাসকবর্গ মুরতাদ হওয়ার কারণে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪৭৯৪

লুতফুর রহমান ও "আহলে হক কর্তৃক সৃষ্ট সংশয়ের জবাব- জিহাদ কি ভূখণ্ড দারুল আমান হওয়া বা না হওয়ার উপর নির্ভরশীল ?

umar mukhtar

Senior Member

০৯-২৭-২০১৬

১। বিগত কিছু দিন আগে মুফতী লুৎফর রহমান ফরায়জী সাহেব এর একটা ষ্ট্যাটাস সামনে আসলো। সেখানে রেফারেন্স হিসেবে একটা লিংক ছিলঃ দারুল ইসলাম, দারুল কুফর বিষয়ে একটি প্রশ্ন-উত্তর। ঐ প্রশ্ন-উত্তরে লুৎফর ফরায়জী সাহেব লিখেছেন,

“আফগানিস্তান ছিল দারুল ইসলামের একটি প্রকৃত চিত্র। যখন মোল্লা উমরের নেতৃত্বে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কিন্তু পরবর্তী কুফরী শক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা আজ বিলীন হয়ে গেছে”।

সাম্প্রতিক পোষ্টে ফরায়জী সাহেব লিখেছেনঃ

“আলোচনা ও বিতর্ক বাংলা*দেশ*কে কেন্দ্র ক*রে। এখা*নে যুদ্ধ বিধ্বস্ত সি*রিয়া, মিশর ফি*লি*স্তিন*কে গু*লি*য়ে না ফেলার অনু*রোধ থাক*বে”।

উনার এই কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে, তার ধারনা অনুযায়ী আফগানিস্তান, সিরিয়া, মিশর কিংবা ফিলিস্তিনের জিহাদগুলো ঠিকই আছে। সেগুলো শরয়ীভাবে বৈধ জিহাদ। উনার আপত্তি শুধু বাংলাদেশে জিহাদ নিয়ে।

বাস্তবে জিহাদের ব্যাপারটা এ রকমই। শরীয়াতের এই অখন্ডনীয় বিধান কেউ সরাসরি অস্বীকার করতে পারে না। তাই দূরের কোন জায়গায় জিহাদ হলে সেটার জন্য গলাবাজি করা অনেক মানুষ পাওয়া যায়। কিন্তু যখনি তা নিজে আমল করার ব্যাপার হয়ে যায়, তখন শুরু হয় নানা রকম অযুহাত আর নিত্য-নতুন শর্ত আরোপের মাধ্যমে নিজের এলাকায় জিহাদ নাজায়েজ প্রমাণ করার প্রাণান্তকর চেষ্টা।

মুফতী সাহেব এর অবগতির জন্য জানাতে চাই, আপনি ভালোভাবে খুজলে

ফিলিস্তিন কিংবা আফগানিস্তানের জিহাদের বিপক্ষে ফতোয়া দেনেওয়ালা কয়েক ডজন মুফতী সাহেবকেও পাবেন!!

২। একই পোষ্টে মুফতী লুৎফর ফরায়জী সাহেব লিখেছেনঃ

"আমরাঃ তাহ*লে আপ*নি বল*তে চান এ দে*শে সবার উপর জিহাদ ফরজ? সরকার উৎখাত এবং দেশীয় আইন আদাল*তের বিরু*দ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করা আমা*দের উপর ফরজ?"

আবার 'বাংলাদেশে কি জিহাদ করা ফরজ হয়ে গেছে?' শিরোনামে এক প্রশ্ন-উত্তরে তিনি লিখেছেনঃ

"দারুল হরবে সবার উপর জিহাদ ফরজ হয়। দারুল আমান বা দারুল ইসলামে নয়। আর বাংলাদেশ দারুল ইসলাম না হলেও দারুল আমান। তাই বাংলাদেশে জিহাদ ফরজ হয়ে গেছে, শসস্ত্র জিহাদে নামতে হবে বলা বিশৃংখা সৃষ্টি আর দ্বীনের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। বাংলাদেশ দারুল আমান। তাই এখানে শসস্ত্র জিহাদ বর্তমানে করা জায়েজ নয়"।

আশ্চর্য্যের ব্যাপার হচ্ছে, এত বড় মুফতি সাহেব (!!) হয়েও তিনি দারুল আমানে তথা বাংলাদেশে 'সশস্ত্র জিহাদ বর্তমানে জায়েজ নয়' – ধরনের অনেক বড় দাবী করলেও এর স্বপক্ষে একটিও দলীল পেশ করেন নি।

বরং, কোন মুসলমানকে কাফের বলা জায়েজ নয়, কাফের বলার ক্ষেত্রে উসূল এর জন্য কিছু দলীল উল্লেখ করে দায়িত্ব শেষ করেছেন!! অথচ, প্রশ্ন-উত্তরের মূল বিষয় 'বাংলাদেশে এখন জিহাদ জায়েজ নয়' – এই ব্যাপারে একটিও দলীল দেয়ার সুযোগ পান নাই। আজব এক মুফতী! আর আজব তার ফতোয়া!!

মুফতী সাহেবকে বলবোঃ যেকোন দাবী করলে দাবীকারীকেই দলীল দিতে হবে। তাই, বাংলাদেশে কোন কোন দলীলের ভিত্তিতে জিহাদ জায়েজ নয় – তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করুন নতুবা দলীল-বিহীন এই দাবী পরিত্যাগ করে, এদেশের মুসলিম জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন।

৩। মুফতী ফরায়জী সাহেব এর কথাগুলো দেখে বুঝা যায়, তিনি এই ধারনা করছেন যে, বাংলাদেশ কিংবা অন্যান্য দেশকে দারুল হারব মনে করায় মুজাহিদ উলামাগণ এসব জায়গায় জিহাদের কথা বলছেন। যেমনঃ শাইখ জসীম উদ্দিন

রাহমানী (আল্লাহ তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত করুন) এর ব্যাপারে মুফতী সাহেব একটি কাল্পনিক কথোপকথনের মধ্যে লিখেছেনঃ

“আমা*দের নেতা জসীমুদ্দীন রহমানী সশস্ত্র সংগ্রা*মের মাধ্য*মে এ কুফরী সরকার উৎখাত ক*রে ইসলামী হুকুমত কা*য়ে*মের ডাক দি*য়ে*ছেন। এ দারুল হরব*কে দারুল ইসলাম প্র*তিষ্ঠা করার ডাক”।

এই ব্যাপারে আমরা মুফতী ফরায়জী সাহেব এর জ্ঞাতার্থে বলতে চাই, মুজাহিদ উলামাগণ বর্তমানে জিহাদ ফরজে আইন হবার কারণ হিসেবে মূলতঃ দুইটি কারণ উল্লেখ করেন।

এক। বিভিন্ন মুসলিম ভূমিতে আগ্রাসী কাফির শক্তির আগ্রাসন। আর এর প্রতিরক্ষায় আক্রান্ত এলাকার মুসলিমরা অপারগ হলে কিংবা অনীহা প্রদর্শন করলে ধীরে ধীরে দুনিয়ার সকল মুসলিমদের উপর ঐ দখলকৃত ভূমি পুনরুদ্ধার করা ফরজে আইন হয়ে যায়। এই ব্যাপারে সালাফদের ইজমা উল্লেখ আছে। চার মাজহাবই এ ব্যাপারে একমত।

এই ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেনঃ

إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام كلها بمترلة البلدة الواحدة، و أنه يجب النفير اليه بلا إذن والد ولاغريم

‘এতে কোন সন্দেহ নেই যে শত্রু কোন কোন মুসলিম এলাকায় প্রবেশ করে, তাহলে ঐ এলাকার বাসিন্দাদের, ক্রমান্বয়ে তাদের নিকটবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের উপর তার প্রতিরক্ষা করা ওয়াজিব হয়ে যায়, কারণ মুসলিমদের ভুমিগুলো হলো একটি ভূমির মতো। তাই এক্ষেত্রে পিতা-মাতা অথবা ঋণদাতার নিকট থেকে অনুমতি ছাড়াই (জিহাদে) বের হয়ে যাওয়া ওয়াজিব। (ফাতাওয়া আল কুবরা, ৪/৬০৮)

আর এটা তো সবাই জানে যে, কর্ডোভা থেকে শুরু করে দিল্লী, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান ইত্যাদি কয়েক ডজন মুসলিম ভূমি কাফিররা দখল করে নিয়েছে। এগুলো এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এই ব্যাপারে আপনি মুজাহিদ শাইখ আব্দুল্লাহ আজ্জাম (রঃ) রচিত ‘মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা’ বইটি দেখতে পারেনঃ লিংকঃ https://archive.org/details/Kklkkkk

.

যদি আপনি আপনার দাবীতে সত্যবাদি হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি এখন প্রমাণ করেন যে, একমাত্র ইসরাইল ছাড়া অন্য কোন দেশে চার মাজহাবের ঐক্যমতের এই ফতোয়ার উপর আমল জায়েজ নয়।

দুই। কোন শাসকের মধ্যে সুস্পষ্ট কুফরী দেখা গেলে (কুফরুন বাওয়াহ) তাকে অপসারণ করা, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথাও উলামাদের ইজমাতে উল্লেখ আছে।

কোন শাসকের মধ্যে প্রকাশ্য কুফরী দেখলে করণীয় এর ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করে ইমাম নববী (রঃ) বলেছেন,

قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب أمام عادل أن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك الا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه

“কাযী ইয়াজ (রঃ) বলেন, ‘এ ব্যাপারে আলেমদের ইজমা রয়েছে যে, কাফিরের হাতে নেতৃত্ব দেয়া যাবে না; সুতরাং তার থেকে যদি কুফরী প্রকাশ পায়, তাহলে তাকে অপসারণ করতে হবে।’” .....

কাযী ইয়াজ (রঃ) আরো বলেন, “সুতরাং তার থেকে কোন কুফরী বা শরীয়াহ পরিবর্তন বা বিদয়াত প্রকাশ পেলে, সে তার দায়িত্ব থেকে খারিজ হয়ে গেল এবং তার আনুগত্যের হক সে হারালো; আর এ অবস্থায় মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব যে, তারা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, তাকে অপসারণ করবে এবং একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক নিয়োগ করবে যদি তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। আর যদি একদল মানুষ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এটি সম্ভব না হয় তবে ঐ দলটিকে রুখে দাঁড়াতে

হবে এবং ঐ কাফিরকে অপসারণ করতে হবে। তবে বিদ'আতীর ক্ষেত্রে এটি আবশ্যক নয় যদি না তারা মনে করে যে তারা এটি করতে সক্ষম। অর্থাৎ যদি সত্যিই অক্ষমতা বিরাজ করে তাহলে বিদ্রোহ করা আবশ্যক নয়, তবে মুসলমানদেরকে ঐ এলাকা থেকে অন্য কোথাও তাদের দ্বীন নিয়ে হিজরত করতে হবে।" (সঃ)হীহ মুসলিম বি শারহুন নববী, কিতাবুল ইমারাহ ১২/২২৮)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী আল হানাফী (রঃ) বলেছেনঃ

وقال الداودي الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا اختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه

দাউদী (রঃ) বলেছেন, আলেমরা এ ব্যাপারে একমত যে, শাসক জালেম হলে যদি সামর্থ থাকে ফিতনা ও জুলুম ছাড়া তাকে অপসারণ করার তাহলে তা ওয়াজিব। তা না হলে ধৈর্য্য ধরা ওয়াজিব। অন্যরা বলেছেন, ফাসিক ও বিদয়াতীর কাছে নেতৃত্ব দেয়া যাবে না। যদি সে প্রথমে ন্যায়পরায়ণ থাকে ও পরে বিদয়াত ও জুলুম করে তবে তার অপসারণ ও বিরুদ্ধাচারণের ব্যাপারে মতভেদ হয়েছে। সঠিক মত হচ্ছে, তা না করা যতক্ষণ না সে কুফরী করে। তখন তাকে অপসারণ ও তার বিরুদ্ধাচারণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। (উমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহুল বুখারী, কিতাবুল ফিতান, ৩০/১১০)

.আর এই ইজমা ইবনে হাজার (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এ ব্যাপারে ইবনে বাত্তাল (রঃ), ইবনে তীন (রঃ), দাউদী (রঃ) প্রমুখও ইজমা উল্লেখ করেছেন। ইবনে হাজার (রঃ) বলেন,

وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا " فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض

"সারমর্ম হলো তাকে তার কুফরীর কারণে অপসারণ করতে হবে, এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানকে এই উদ্দেশ্যে রুখে দাঁড়াতে হবে, যার

এই কাজ করার শক্তি আছে তার জন্য রয়েছে সওয়াব, যে এটা অবহেলা করবে সে গুনাহগার হবে, আর যে এতে অসমর্থ তার জন্য ওয়াজিব হবে ঐ এলাকা থেকে হিজরত করা।" (ফাতহুল বারী, কিতাবুল ফিতান, ১৩/১২৩)

আর আপনি নিজে বাংলাদেশকে 'দারুল আমান' মনে করেন, যে 'দারুল আমানের' সংজ্ঞা আপনি এভাবে দিয়েছেন যে,

"অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও স্বীয় ধর্ম পালনে স্বাধীন। কোন ধর্ম পালনেই রাষ্ট্র পক্ষ থেকে কোন বিধি-নিষেধ নেই। তবে আইন চলে মানবরচিত আইন বা কুফরী আইন। তাহলে উক্ত রাষ্ট্রের নাম হবে দারুল আমান"।

অর্থাৎ, আপনি নিজেও সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করেন যে, বাংলাদেশ মানবরচিত কুফরী আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। এর এর বিভিন্ন কুফরী চক্ষুস্মান সকলের কাছেই সুস্পষ্ট। এ রকম স্পষ্ট কুফর বা কুফরুন বাওয়াহ এর ক্ষেত্রে উলামাগণ ইজমা উল্লেখ করেছেন যে, এ রকম শাসকদেরকে হটাতে হবে। এই ব্যাপারে শাইখ আব্দুল ক্বাদির ইবনে আব্দুল আজিজ (ফাঃ আঃ) রচিত 'আল উমদাহ ফিল ইদাদ আল উদ্দাহ' কিতাবের 'জিহাদের ব্যাপারে মৌলিক নীতিমালা' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। বইটির লিংক

http://shamela.ws/rep.php/book/৩৯৮৮

.

যদি আপনি আপনার দাবীতে সত্যবাদি হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি এখন প্রমাণ করেন যে, একমাত্র ইসরাইল রাষ্ট্র ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন দেশে উপরে উল্লেখিত ইজমার উপরও আমল জায়েজ হবে না।

উপরুক্ত বইগুলো পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন যে, বাংলাদেশ দারুল হরব নাকি দারুল আমান এর উপর ভিত্তি করে আমাদের উপর জিহাদ ফরজ হয় না। মুজাহিদ উলামাগণ 'দ্বার' এর হুকুম এর উপর ভিত্তি করে জিহাদের ফরজিয়াতের কথা বলেন না।

বরং বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষার ফরজটি সকল প্রকার দ্বারের অধিবাসীদের জন্যই ইজমা অনুযায়ী ফরজ হবে। আর শাসক 'কুফরুন

বাওয়াহ' করলে সেটা দারুল ইসলাম হলেও তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব হবে। এগুলো উম্মাতের উলামায়ে কেরামের ইজমা।

শাইখ জসীম উদ্দিন রাহমানী (ফাঃ আঃ)-ও বিভিন্ন বয়ানে উপরুক্ত কারণগুলো উল্লেখ করে জিহাদ ফরজ এর কথা এ দেশের মানুষকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এর বাইরেও তিনি শাতিমুর রাসুল (সাঃ)-দের হত্যা করার জন্যও মুসলিম যুবকদেরকে উৎসাহিত করেছেন। যা সালাফে সালেহীনদের বক্তব্য ও আ'মলের সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ শাইখকে দুনিয়া ও আখিরাতে যথাযথ প্রতিদান দিন। আর শাতেমুর রাসুল (সাঃ)-দেরকে হত্যা করার জিহাদকে আপনি নিজেও অস্বীকার করবেন বলে, আমাদের মনে হয় না। কারণ এটাও জমহুর উলামাদেরই মতামতের উপর আ'মল।

উপরুক্ত কারণগুলোর ভিত্তিতে মুজাহিদ আলেমগণ বাংলাদেশসহ সকল দেশে সশস্ত্র জিহাদ ফরজ বলে উল্লেখ করেন। আর দলীল হিসেবে আমরা উলামাদের ইজমার কথা উল্লেখ করলাম। এবার আপনি আপনার দলীল এনে প্রমাণ করে দিন যে, বাংলাদেশে সশস্ত্র জিহাদ জায়েজ নয় – যদি আপনি সত্যবাদি হয়ে থাকেন।

৪। যদিও আমরা মনে করি, বাংলাদেশ দারুল আমান নাকি দারুল কুফর এর উপর ভিত্তি করে আমাদের উপর জিহাদ ফরজ হয় না, কারণ মুজাহিদ উলামাগণ এই রকম বলেন না। তারপরও আপনার 'দারুল আমান' নিয়ে আলোচনার ব্যাপারে কিছু কথা আছে। দারুল আমানের সংজ্ঞা হিসেবে আপনার দেয়া রেফারেন্স কামুসুল ফিক্বহ-৩/৩৯৯-তে উল্লেখ আছেঃ

অর্থাৎ, "দারুল আমান ঐ এলাকা, যেখানে মূল ক্ষমতা (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা) কাফিরদের (গাইরে মুসলিম) হাতে থাকে, কিন্তু মুসলিমরা নিরাপদ থাকে। মুসলিমরা দ্বীনি দাওয়াতের ফরজিয়াত আদায় করতে পারে, আর এমন সব ইসলামী আহকাম পালন করতে পারে যেগুলো পালন করার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দরকার হয় না"।

আপনার রেফারেন্সে দেয়া এই সংজ্ঞা অনুযায়ীও আপনাদের মতামত অনুযায়ী বাংলাদেশ 'দারুল আমান' হয় না। কারণঃ

ক) রাষ্ট্রীয় পরিচালনার ক্ষমতা কাফিরদের (গাইরে মুসলিম) হাতে থাকে।

- আপনার মতে কি হাসিনা-খালেদারা ও তাদের সরকারগুলো কাফির-মুরতাদ তথা গাইরে মুসলিম? আপনি কি এটা মনে করেন? এরকম কিছু তো আপনাদের তরফ থেকে আমরা কখনো শুনিনি।

- যদি হাসিনা-খালেদা তথা এই শাসকগোষ্টী গাইরে মুসলিম (মুরতাদ) হয়ে থাকে, তাহলে তাদের আনুগত্যের দাবী কেন করে থাকেন?

- যদি হাসিনা-খালেদা তথা এই শাসকগোষ্টী গাইরে মুসলিম (মুরতাদ) হয়ে থাকে, তাহলে তাদের অপসারনের চেষ্টা কেন করেন না, যা ইজমা অনুযায়ী ওয়াজিব?

খ) 'কিন্তু মুসলিমরা নিরাপদ থাকে'।

বাংলাদেশে সকল মুসলিমরা কি বর্তমানে নিরাপদ আছে কিংবা পূর্বে ছিল?

- হ্যাঁ, ঐ সকল মুসলিমরা নিরাপদ যারা ভুলেও এদেশে শরীয়াত প্রতিষ্টার কথা বলে না। এদেশের কুফরী সংবিধান পরিবর্তনের কথা বলে না। ফরজে আইন জিহাদে শরীক হবার আহবান জানায় না - সেটা হোক আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন কিংবা অন্য কোন এলাকায়।

- যদি আপনি মনে করেন এখানে মুসলিমরা নিরাপদ, তাহলে আপনি আফগানিস্তান কিংবা সিরিয়া কিংবা ফিলিস্তিনের জিহাদের পক্ষে বয়ান দিয়ে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে তাহরীদ করুন তো দেখি... তাহলে হয়তো বুঝে যাবেন – এটা কেমন দারুল আমান!!

- এখানে ঐ সকল মুসলিমরা কখনো নিরাপদ নয় যারা প্রচলিত কুফরী আইন পরিবর্তন করে শরীয়াত কায়েম করার কথা বলেন, যারা কুফরী সংবিধান পরিবর্তন করার কথা বলেন। যদি আপনি মনে করেন এখানে মুসলিমরা নিরাপদ, তাহলে এদেশের কুফরী আইন ও শাসনকে পরিষ্কার কুফরী উল্লেখ করে বয়ান দিয়ে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে এই কুফর পরিত্যাগ করা আহবান করেন তো দেখি... তাহলে হয়তো বুঝে যাবেন – এটা কেমন দারুল আমান!!

শুধু ফিকহী ইখতেলাফী বিষয়ে মাঠ গরম করে সস্তা বাহবা পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবে এই ভূমি কি দারুল আমান নাকি দারুল কুফর – তার হাকীকত বুঝতে পারবেন না।

গ) 'মুসলিমরা দ্বীনি দাওয়াতের ফরজিয়াত আদায় করতে পারে'।

- হ্যাঁ যদি শুধু নামাজ, রোযা, জিকির আর ইখতেলাফী মাসআলা নিয়ে বাহাসের দাওয়াতের কথা বলেন, তাহলে ঠিক আছে।

কিন্তু আপনি তাওহীদ আল হাকিমিয়া তথা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন, আল্লাহর দেয়া হুদুদগুলো বাস্তবায়নের দাওয়াত দেন, আল্লাহর দেয়া হারামগুলো বাতিল করে শরীয়াতের আহকামগুলো বাস্তবায়নের দাওয়াত দেন, তাহলে বুঝতে পারবেন – এটা কেমন দারুল আমান!!

- হ্যাঁ, অনেকেরই মনোরঞ্জনের বিষয় 'ফিকহী ইখতেলাফ' নিয়ে বাহাস করলে আপনি হবেন সমাজের অনেকের চোখে 'হিরো'। কিন্তু এই 'হিরো' আবার 'জিরো' হয়ে যাবেন যদি কিছুদিন আল্লাহর দেয়া শরীয়াতের কায়েমের দাওয়াত দিতে থাকেন। আল্লাহর দেয়া ফরজ বিধান ক্বিতালের ব্যাপারে মানুষকে তাহরীদ করতে থাকেন। তখন বুঝতে পারবেন, এদেশে দ্বীনি দাওয়াতের ফরজিয়াত আদায় করা যায় কিনা?

নাকি আপনি মনে করেন, শুধু নামাজ, রোযা, জিকির আর ইখতেলাফী মাসআলা নিয়ে বাহাসের দাওয়াত দিলেই এই ফরজিয়াত আদায় হয়ে যায়??

৫। একইভাবে আপনি দারুল আমানের সংজ্ঞা লিখেছেনঃ

"দারুল আমান কাকে বলে? যে সকল রাষ্ট্রে মুসলিমগণ স্বাভাবিকভাবে স্বীয় ধর্ম পালনে সক্ষম। চাই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হোক বা সংখ্যালঘিষ্ঠ। কিন্তু ইসলামের শাস্তির বিধান প্রয়োগ করতে সক্ষম নয়। তবে দ্বীন প্রচার ও পালনে স্বাধীন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও স্বীয় ধর্ম পালনে স্বাধীন। কোন ধর্ম পালনেই রাষ্ট্র পক্ষ থেকে কোন বিধি-নিষেধ নেই। তবে ইসলামী আইন উক্ত রাষ্ট্রে প্রচলিত নয়। আইন চলে মানবরচিত আইন বা কুফরী আইন"।

"বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই দারুল আমান। এমনকি আমেরিকা ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোও। কারণ সেখানে সকল ধর্মাবলম্বীরাই স্বীয় ধর্ম পালনে ও প্রচারে স্বাধীন। রাষ্ট্র পক্ষ থেকে কোন প্রকার বিধি-নিষেধ নেই। যদিও সরকারী আইন ইসলামী নয়। এ হিসেবে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ অধিকাংশ রাষ্ট্রই দারুল আমানের অন্তর্ভূক্ত"।

বিদগ্ধ মুফতী সাহেব!! খেয়াল করে দেখুনঃ

ক) মুসলিমগণ স্বাভাবিকভাবে স্বীয় ধর্ম পালনে সক্ষম।

হ্যাঁ, আমরা অনেকগুলো ইবাদত স্বাভাবিকভাবে করতে পারি বটে কিন্তু আমরা শরীয়াতের বর্ণিত সকল ইবাদত পালন করতে পারি না। তাই, এদেশে মুসলিমরা স্বাভাবিকভাবে স্বীয় ধর্ম পালনে সক্ষম না।

- আপনি কি এ সকল মুরতাদ সরকারকে জানিয়ে শুধু একাকী আফগানিস্তানে জিহাদে শরীক হবার জন্য যেতে পারবেন? এই সরকারগুলো কি আপনাকে যেতে দিবে? এই জিহাদে শরীক হওয়া কি ইবাদতের মধ্যে সামিল নয়? এটা কি ধর্ম পালনের মধ্যে পড়ে না? নাজ্জাসীর রাজ্য থেকে তো সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) চাইলে গিয়ে রাসুল (সাঃ) ও কাফিরদের মধ্যে সংগঠিত জিহাদে শরীক হতে পারতেন। সেখানে এই ইবাদতে বাঁধা ছিল বলে মনে হয় না।

- আপনি কি আপনার বয়ানে, আলোচনায় সিরিয়া, আফগানিস্তান, মিশর, ফিলিস্তিনের জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর (যেগুলোকে আপনার কাছে শরীয়াতসম্মত মনে হয়) আলোচনা করতে পারবেন? আপনি কি সাধারণ জনগণকে ও আপনার ছাত্রদেরকে ঐসব ময়দানে ক্বিতালের শরীক হবার জন্য জন্য উদ্ভুদ্ধ করতে পারবেন? মুমিনদেরকে ক্বিতালের জন্য উদ্ভুদ্ধ করা কি একটা ইবাদত নয়? এটাও কি ধর্ম পালন নয়?

- আপনি কি এদেশে শরীয়াত কায়েমের জন্য আহবান জানাতে পারবেন? এই কুফরী সংবধানকে কুফরী উল্লেখ করে এ থেকে সাধারণ জনগণকে দূরে সরে যেতে বলতে পারবেন? মানুষকে এই হক্কের দাওয়াত দেয়া কি ইবাদতের মধ্যে সামিল নয়? এটা কি ধর্মের একটা অংশ নয়?

নাকি আপনার মতে, দারুল আমানে শরীয়াত কায়েমের চেষ্টা করাও জায়েজ নয়?? যদি দারুল আমানে শরীয়াত কায়েমের চেষ্টা করাও জায়েজ না থাকে, তাহলে কিন্তু আপনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এটাই বলছেন, যে একমাত্র ইসরাইল রাষ্ট্র ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোথাও আল্লাহর শরীয়াত কায়েমের চেষ্টা করা জায়েজ নেই!! সুবহানাল্লাহ, যদি আপনি এই ফতোয়া দেন, তাহলে শয়তান হয়তো খুশী হয়ে

আপনাকে গুরু মেনে নিবে! শয়তানের জন্য এত বড় খেদমত হয়তো দুনিয়ার আর কেউ করতে পারবে না!!!

খ। 'তবে দ্বীন প্রচার ও পালনে স্বাধীন'।

না, বরং বাস্তবতা হচ্ছে দ্বীনের কিছু কিছু বিধান প্রচার ও পালনে স্বাধীন যেগুলো এই কুফরী শাসন ব্যবস্থার বিপক্ষে যায় না, যেগুলো এই কুফরী শাসন ব্যবস্থা নিজের জন্য ঝুকিপূর্ণ মনে করে না। কিন্তু দ্বীনি অনেক বিধানের প্রচার ও পালনই এই মুরতাদ সরকার সহ্য করতে পারে না। এটাই বাস্তবতা।

.

৬। আপনি লিখেছেন,

"নী*রিহ বেসাম*রিক বিধর্মী হত্যার নাম কিছু*তেই জিহাদ নয়। প*রিস্কার সন্ত্রাস"।
আপনি কাদেরকে নিরীহ দাবী করেছেন তা পরিষ্কার নয়। আপনি কিঃ

- শাতেমুর রাসুল (সাঃ)-দেরকে নিরীহ বলছেন?

- আপনি কি আগ্রাসী আমেরিকান কুফফারদেকে নিরীহ বলছেন?

- আপনি কি ন্যাটো জোটভূক্ত ক্রুসেডার দেশগুলোকে নিরীহ বলছেন?

আপাতত আপনার এই 'নিরীহ বেসামরিক'দের ব্যাপারে শাইখ সালিহ আল উসাইমিন (রঃ) এর ছোট্ট একটা আলোচনা শুনতে বলবো। এর লিংক হচ্ছে এইঃ

www.youtube.com/watch?v=bPVpv_afBHA

.

আল্লাহ সবাইকে হক্ককে হক্ক হিসেবে দেখার, এবং তা অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ সবাইকে বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখার এবং তা পরিত্যাগ করার তৌফিক দান করুন।

[সংগ্রহীত]

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪৭৯৬

লুতফুর রহমান ফরাজি ও "আহলে হক কর্তৃক সৃষ্ট সংশয়ের জবাব-৪ - দারুল মুয়াদায়াহ ও দারুল আহাদ / দারুল আমান

umar mukhtar

Senior Member

১০-০৫-২০১৬

দারুল মুয়াদায়াহ(دار الموادعة) /দারুল আহাদ (دار العَهْد)/ দারুল আমান (دار الأمن)

দারুল কুফর যদি মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ না হয় তাহলে তা হারবী রাষ্ট্র বা দারুল হারব হিসাবেই গণ্য হবে। আর চুক্তি বা সন্ধি থাকলে তা 'দারুল আহাদ' (চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র) বলে গণ্য হবে। ফুকাহায়ে আহনাফ মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ দারুল কুফর এর ক্ষেত্রে 'দারুল মুয়াদায়াহ' (সঃ)ন্ধির আওতাধীন রাষ্ট্র) পরিভাষা ব্যাবহার করেছেন। (দেখুনঃ শারহু সিয়ারীল কাবীর, খণ্ড-৫, অধ্যায়ঃ বাবুল মুয়াদায়াহ। বাদায়েউস সানায়ে', কিতাবুস সিয়ার, অধ্যায়ঃ মা ইয়া'তারিদু মিনাল আসবাবিল মুহাররমাহ লিল-কিতাল)

"দারুল আমান" শব্দটি পরিভাষা হিসাবে মুতাকাদ্দিমীন মুতায়াখখিরীন মুজতাহিদ ফুকাহাগন ব্যাবহার করেননি। তবে বর্তমান অনেককে এই পরিভাষা ব্যাবহার করতে দেখা যায়। যদি "দারুল আমান" পরিভাষাটি দ্বারা উদ্দেশ্য হয় 'দারুল মুয়াদায়াহ' বা ঐ দারুল কুফর যার সাথে মুসলিমদের সন্ধি বা চুক্তি আছে তাহলে তো তা ঠিক আছে। কিন্তু যদি তা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় ভিন্ন কিছু তাহলে তাদের জন্য জরুরী হবে এর পক্ষে শরয়ী নির্ভরযোগ্য দলীল পেশ করা।

মুরতাদ শাসনাধীন রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি মুরতাদ যদি কোন ইসলামী রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ করে শাসন করে তাহলে তা দারুল কুফরে পরিণত হবে। তবে তাদের সাথে সন্ধি/চুক্তি করা যাবে কিনা এই ব্যাপারে ফুকাহাদের মাঝে দ্বিমত আছে, অনেকে সন্ধি করতে নিষেধ করেছেন ---

আল্লামা মাওয়ারদী রহঃ বলেনঃ

ولا يجوز إقرار المرتد على ردته بجزية ولا عهد، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تنكح منه إمرأة

জিযিয়া বা চুক্তির মাধ্যমে মুরতাদকে স্বীকৃত দেয়া বৈধ নয়। তার জবেহ খাওয়া যাবে না। তার সাথে কোন মেয়ের বিবাহ জায়েয নেই। (আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ) তবে যদি তাদের সাথে যুদ্ধের শক্তি না থাকে তাহলে হানাফী ফুকাহাদের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি জায়েয। আর শক্তি থাকলে জায়েয নয়।

ইমাম হাসকাফী রহঃ বলেনঃ

و نصالح المرتدين لو غلبوا على بلدة وصارت دارهم دار حرب لو خيرا بلا مال وإلا يغلبوا على بلدة (لا) لان فيه تقرير المرتدين على الردة وذلك: لا يجوز .

মুরতদরা যদি কোন অঞ্চল কবজা করে নেয় আর তাদের অঞ্চল দারুল হারব হয়ে যায়, যদি কল্যাণ দেখি তাহলে আমরা তাদের সাথে সন্ধি করব। কোন অর্থ ছাড়া। আর যদি তারা কোন অঞ্চল দখল করতে না পারে তাহলে তাদের সাথে চুক্তি করা যাবে না। কেননা চুক্তির মাধ্যমে মুরতাদকে তাদের রিদ্দার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দেয়া হবে আর এটা জায়েয নেই। (আদ দুররুল মুখতার, কিতাবুল জিহাদ, খণ্ড-৪,পৃষ্ঠা-৩১০)

শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসী রহঃ বলেনঃ-

ولا بأس في هذه الحالة بموادعة المرتدين الذين غلبوا على دارهم لأنه لا قوة للمسلمين على قتالهم فكانت الموادعة خيراً لهم

এই অবস্থায় (দুর্বলতার সময়) মুরতাদদের সাথে সন্ধি করতে কোন সমস্যা নেই। যারা তাদের অঞ্চল কবজা করে নিয়েছে। কেননা তাদের সাথে যুদ্ধের শক্তি মুসলিমদের নেই। তাই তাদের সাথে চুক্তি করাই কল্যাণকর হবে। (শারহু সিয়ারীল কাবীর, বাবুল মুয়াদায়াহ, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪)

ইমাম সারাখসী রহঃ আরও বলেনঃ

وبعد ما غلبوا على دارهم فقد صارت دارهم دار الحرب حتى إذا وقع الظهور عليهم يكون مالهم غنيمة للمسلمين

মুরতাদরা যখন নিজ এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে তখন তাদের অঞ্চল দারুল হারবে পরিণত হয়। আর যখন আবার তাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন হবে তখন তাদের মাল গণিমতে পরিণত হবে।(শারহু সিয়ারীল কাবীর, বাবুল মুয়াদায়াহ, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪)

ইমাম কাসানী রহঃ বলেনঃ

وتجوز موادعة المرتدين إذا غلبوا على دار من دور الإسلام ، وخيف منهم ، ولم تؤمن غائلتهم لما فيه من مصلحة دفع الشر للحال ،

মুরতাদরা যদি মুসলিমদের কোন ভূখণ্ড দখলে নেয়। আর তাদের থেকে বিপদের আশংকা করা হয়। তাদের বিপর্যয় থেকে নিরাপদ না থাকা যায়, তাহলে তাদের সাথে চুক্তি জায়েয আছে। কেননা এর মাঝে তাৎক্ষণিক বিপদ প্রতিহতের কল্যাণ নিহিত। (বাদাইউস সানায়ে', কিতাবুস সিয়ার, অধ্যায়- ফী-বায়ানী মা ইয়া'তারিদু মিনাল আসবাবিল মুহাররমাহ লিল-কিতাল)

নোটঃ (১) মুরতাদরা মুসলিমদের কোন অঞ্চল কবজা করলে তা দারুল কুফর হয়ে যাবে। (২) মুসলিমদের দুর্বলতার সময় তাদের সাথে চুক্তি ও সন্ধিতে আসা আহনাফের নিকট জায়েয।

যুদ্ধ না করে সন্ধির শর্ত : কাফির ও মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ না করে সাময়িক চুক্তির ক্ষেত্রে আহলুল ইলম বেশ কয়েকটি শর্ত উল্লেখ করেছেন। যার মাঝে কিছু শর্তের ব্যাপারে তারা মুত্তাফিক (ঐকমত) কিছু শর্তের ব্যাপারে মুখতালিফ (ভিন্নভিন্ন মত পোষণকারী)। আমরা এখানে শুধু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ফিকহে হানাফীর আলোকে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

প্রথম শর্তঃ মুসলিমরা দুর্বল হতে হবে। যুদ্ধ করার শক্তি না থাকতে হবে। যুদ্ধের শক্তি থাকলে সন্ধি বা চুক্তি করা যাবে না। ইমাম সারাখসী রহঃ বলেনঃ

قال أبو حنيفة - ﷺ - : لا ينبغي موادعة أهل الشرك إذا كان بالمسلمين عليهم قوة لأن فيه ترك القتال المأمور به أو تأخيره وذلك مما لا ينبغي للأمير أن يفعله من غير حاجة قال الله - تعالى - : {وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَ أَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} الأنفال الاية 139

আবু হানীফা রাদি আল্লাহু আনহু বলেনঃ- মুশরিকদের সাথে সন্ধি করা যাবে না, যখন মুসলিমরা তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী হবে। কেননা সন্ধির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত বিধান কিতাল তরক করতে হয়। অথবা বিলম্ব করতে হয়। আর কোন আমীরের জন্য প্রয়োজন ছাড়া এটা করা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে। (শারহু সিয়ারীল কাবীর, বাবুল মুয়াদায়াহ, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩)

তৃতীয় শর্ত: আজীবনের জন্য করা যাবে না। বরং তা নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত হতে হবে। এই সময়ের ব্যাপারে ফুকাহাদের মাঝে দ্বিমত আছেন। কেউ বলেছেন ৪ মাস। কেউ ২ বছর, কেউ ১০ বছর সর্বোচ্চ। তবে ফিকহে হানাফীর গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে ততদিন রাখা যাবে যত দিন এর মাঝে মুসলিমদের কল্যাণ থাকবে।

ইবনে হুমাম রহঃ বলেনঃ

وَلَا يَقْتَصِرُ الْحُكْمُ وَهُوَ جَوَازُ الْمُوَادَعَةِ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ عَشْرُ سِنِينَ لِتَعَدِّي الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ عَلَّلَ جَوَازَهَا ، وَهُوَ حَاجَةُ الْمُسْلِمِينَ أَوْ ثُبُوتُ مَصْلَحَتِهِمْ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِأَكْثَرَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْمُوَادَعَةُ أَوْ الْمُدَّةُ الْمُسَمَّاةُ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ

সন্ধি জায়েয হবার হুকুম উল্লেখিত ১০ বছর সময়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ হবে না। যে কারণে সন্ধি জায়েজ করা হয়েছে তা বাকি থাকার কারণে। আর তা হচ্ছে, মুসলিমদের জরুরত ও তাদের কল্যাণ বিদ্যমান থাকা। তাই কখনও সময় বেশীও হতে পারে। তবে যদি সন্ধি বা উল্লেখিত সময় মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর না হয় তাহলে তা জায়েয হবে না। (ফাতহুল কাদীর, পরিচ্ছেদঃ কিতাবুস সিয়ার, অধ্যায়ঃ বাবুল মুয়াদায়াহ)

বুরহানুদ্দীন মারগিনানী রহঃ বলেনঃ

وإن صالحهم مدة ثم رأى نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم

যদি তাদের সাথে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সন্ধি করা হয় অতঃপর দেখা যায় চুক্তি ভেঙ্গে ফেলাটাই উত্তম তাহলে তাদেরকে চুক্তি ভেঙ্গে ফেলার সংবাদ পৌঁছাবে। এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। (আল-হেদায়া, কিতাবুস সিয়ার, বাবুল মুয়াদায়াহ)

নোটঃ শরীয়তের মধ্যে আসল হচ্ছে হারবীদের সাথে কিতাল করা। তবে শর্ত সাপেক্ষে কখনো কখনো সন্ধি করাও জায়েয আছে। সন্ধির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জিহাদের জন্য যাতে মুসলিমগণ প্রস্তুতি নেবার অবকাশ পায়।

চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে সামরিক সহায়তা ইমাম ইবনে হুমাম রহঃ বলেনঃ

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُبَاعَ السِّلَاحُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَلَا يُجَهَّزُ إلَيْهِمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَحَمْلِهِ إلَيْهِمْ ، وَلِأَنَّ فِيهِ تَقْوِيَتَهُمْ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَا الْكُرَاعُ لِمَا بَيَّنَّا ، وَكَذَلِكَ الْحَدِيدُ لِأَنَّهُ أَصْلُ السِّلَاحِ ، وَكَذَا بَعْدَ الْمُوَادَعَةِ ؛ لِأَنَّهَا عَلَى شَرَفِ النَّقْضِ أَوْ الِانْقِضَاءِ فَكَانُوا حَرْبًا عَلَيْنَا ،

হারবীদের নিকট অস্ত্র বিক্রি করা তাদেরকে অস্ত্রে সজ্জিত করা যাবে না। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারবীদের নিকট অস্ত্র বিক্রি করতে ও রপ্তানি করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এর দ্বারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদেরকে শক্তিশালী করা হবে। তাই তা নিষেধ। একই ভাবে ঘোড়া, লোহাও কেননা অস্ত্রের মূল সেটাই। অনুরূপ সন্ধির পরও জায়েয নেই। কেননা সন্ধি ভঙ্গে গেলে বা ভেঙ্গে দিলে তারা আমাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করবে। (ফাতহুল কাদীর, পরিচ্ছেদঃ কিতাবুস সিয়ার, অধ্যায়ঃ বাবুল মুয়াদায়াহ)

ইমাম সারাখসী রহঃ বলেনঃ

ولا يمنع التجار من حمل التجارات إليهم إلا الكراع والسلاح والحديد لأنهم أهل حرب وإن كانوا موادعين ألا ترى أنهم بعد مضي المدة يعودون حربا للمسلمين

ব্যবসায়ীদেরকে দারুল আহদের অধিবাসীদের কাছে ব্যবসায়ী পণ্য রপ্তানি করতে নিষেধ করা হবে না। তবে ঘোড়া অস্ত্র লোহা রপ্তানি করতে পারবে না। কেননা তারা হারবী। যদিও এখন চুক্তিবদ্ধ। তুমি কি জাননা! সময় শেষ হবার পর তারা পুনরায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। (আল-মাবসূত, কিতাবুস সিয়ার খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৮৮)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪৯৪৬

জামাতের গুরুত্ব

hindustani mujahid

Member

১০-২৬-২০১৬

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে-

জামাআতের গুরুত্ব, পরিপ্রেক্ষিত বর্তমান সমাজ

আল্লাহ তাআলা সালাতের মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। পবিত্র কুরআনের বহু জয়গায় সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন । সালাতের প্রতি যত্নবান ও জামাআতভুক্ত হয়ে সালাত আদায়ের আদেশ করেছেন। সালাতকে গুরুত্বপূর্ন ইবাদত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন ও আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:—

و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة واركعوا مع الر اكعين – سورة البقرة :43

আর সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং সালাতে রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। (বাকারা-৪৩)

আর এর প্রতি অবমাননা এবং তা আদায়ে অলসতা মুনাফিকের আলামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে :—

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ:142

মুনাফিকরা অবশ্যই প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে অথচ তারা প্রকারান্তরে নিজেদেরই প্রতারিত করছে । বস্তুতঃ তারা যখন সালাতে দাড়ায় তারা দাড়ায় একান্ত শিথিলভাবে। (সূরা নিসা-১৪২)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :—

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. سورة التوبة: 54

তারা সালাতে আসে আলস্যভরে (সূরা তওবা : ৫৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের প্রতি অচ্ছেদ্যভাবে যত্নবান ছিলেন। যুদ্ধ কি শান্তি, সুস্থ কি অসুস্থ সকল অবস্থায় এমনকি ওয়াফতের পূর্বে মৃত্যব্যাধিতে আক্রান্ত অবস্থায়ও তিনি সালাত আদায়ে অবহেলা করেননি বিন্দুমাত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ, ও পরবর্তীতে তাবেয়ীন ও উত্তম পূর্বপুরুষগণ সালাতের প্রতি ছিলেন বর্ণনাতীতভাবে ঐকান্তিক, একনিষ্ঠ। তবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি রীতিমতো ঘাবড়ে দেবার মতো। বর্তমানে অনেক মুসলমানই সালাত আদায়ে দারুণভাবে উদাসীন। জুমার সালাতে মসজিদে উপচে-পড়া ভীড় হচ্ছে ঠিকই তবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে মসজিদের অধিকাংশ জায়গাই থাকে মুসুল্লিশূন্য। সালাত বিষয়ে মুসলমানদের অবহেলার আদৌ কোন কারণ থাকতে পারে না। সালাত বিষয়ে অবহেলার অর্থ ঈমানের একটি মৌলিক দাবি , ইসলামের একটি প্রধানতম নিদর্শন বিষয়ে অবহেলা । আর যারা এ ধরনের অবহেলা প্রদর্শনে অভ্যস্ত তাদের অপেক্ষায় থাকবে মর্মন্তুদ শাস্তি, কঠিন নারকীয় আযাব।

আমাদের পূর্বপুরুষগণ জামা'আতভুক্তিতে সালাত আদায়ের প্রতি খুবই যত্নশীল। তাদের নিকট এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম ; এমনকি জামাত ছুটে গেলে খুবই মর্মাহত হতেন। তারা। মনোকষ্টে অশ্রু ঝরাতেন। সমবেদনা জানাতেন একে অপরকে জামাত ছুটে যাওয়ার কারণে ।

জামাআতভুক্তিতে সালাত না আদায়ের ফলে সালফে সালেহীনের মনোবেদনা

মুহাম্মদ বিন মুবারক আ'সম রহ. বলেন :— 'আমি জামা'আতে সালাত আদায়ে সক্ষম না হওয়ায় শুধুমাত্র আবু ইসহাক আল-বুখারীই সমবেদনা জানান। অথচ যদি আমার পিতা মারা যেত, তাহলে দশ হাজারেরও বেশী মানুষ আমাকে সমবেদনা জানাত। কেননা ধর্ম পালন করতে গিয়ে কষ্ট শিকার, তাদের নিকট, দুনিয়ার মুসীবতের চেয়েও সহজ মনে হত।

জামা'আতে সালাত আদায় তাদের নিকট দুনিয়ার সম্পদ অর্জনের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অথচ আমরা দুনিয়ার পিছনেই লেগে রয়েছি মরিয়া হয়ে। দুনিয়-অর্জন ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই ভয়ে অনেক সময় সালাতও আদায় করছি দেরী করে।

শুধু তাই নয় বরং আমাদের মাঝে এমন অনেকই আছেন, যারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্যের পিছনে তড়িত হয়ে সালাত আদায়ই ছেড়ে দিয়েছে সম্পূর্ণভাবে।

মায়মুন বিন মেহরান রহ. মসজিদে এলে তাকে বলা হল, সমস্ত লোক চলে গিয়েছে। তিনি বললেন :—

إنا لله و إنا إليه راجعون

'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'। এই সালাতের মর্যাদা আমার নিকট ইরাকের গভর্ণর হওয়ার চেয়েও অধিক প্রিয়।

ইউনুস বিন আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, আমার যদি মুরগী হারিয়ে যায়, তবে আমি তার জন্য চিন্তিত হই, অথচ সালাত ছুটে গেলে তার জন্য চিন্তিত হই না!সালফে সালেহীনগণ সালাতের আওয়াজ শোনার সাথে সাথে মসজিদে যাবার জন্য প্রতিযোগিতা করতেন। ইমামের সাথে প্রথম তাকবীরে উপস্থিত হবার জন্য তারা সকলে ছিলেন প্রচন্ড আগ্রহী ।

সাঈদ নি মুসায়্যিব রহ. বলেন : পঞ্চাশ বৎসর ধরে আমার প্রথম তাকবীর ছুটেনি, পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত আমি ফরয নামাযে মানুষের ঘাড় দেখিনি। অর্থাৎ তিনি পঞ্চাশ বৎসর ধরে প্রথম কাতারেই শমিল ছিলেন।

ওয়াকী বিন জারাহ রহ. বলেন : প্রায় সত্তর বৎসর পর্যন্ত আ'মাশ রহ. এর প্রথম তাকবীর ছুটেনি। ইবনে সামাআহ রহ. বলেন : চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত আমার তাকবীরে উলা ছুটেনি। শুধু যে দিন আমার মায়ের মৃত্যু হয়, সে দিন ছুটেছিল।

প্রিয় ভাই ! আমাদের অবস্থা আর সালফে সালেহীনের অবস্থার মাঝে অনেক ব্যবধান তাদের নিকট সালাতের গুরুত্ব ছিল আপরিসীম, আর আমরা এর অবমাননা করছি হরহামেশা। তারা এর প্রতি যত্নবান ছিলেন। আর আমারা করছি অলসতা। তারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্যের উপর সালাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আর আমরা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি এবং একে (সালাতকে) পিছনে ফেলে রেখেছি। এর গুরুত্বপূর্ণ ছাওয়াব ও অফুরন্ত ফযীলতের প্রতি তাদের উৎসাহ ছিল অপরিসীম। আর আমরা এ থেকে বিমুখ।

জামা'আতে সালাত আদায়ের ফযীলত ও ফলাফল :—

জামা‘আতে সালাত আদায়ের ফযীলত ও মর্যাদা অনেক। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ

১। সালাত পাপমোচন এবং মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ :—

عن أبي هريرة ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ» رواه الترمذي 48:

আবূ হুরায়রা t থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি কি তোমাদের এমন বিষয় জানাব না, যার মাধ্যমে আল্লাহ গুনাহসমূহ মোচন করে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন ? সাহাবায়ে কিরাম বললেন : হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল ! তিনি বললেন : তা হচ্ছে কষ্টের সময়ে যথাযথভাবে অযু করা, মসজিদের দিকে বেশি বেশি পদচারণ করা এবং এক সালাতের পর অন্য সালাতের অপেক্ষায় থাক। *এটাই হল সীমান্ত প্রহরা। (তিরমিযী : ৪৮)

অন্য হাদীসে এসেছে :

عن عبد الله بن عمرو ﷺ : أن رسول الله صلى الله قال : «مَنْ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ الجَمَاعَةِ فَخُطْوَةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً وَخُطْوَةٌ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً، ذَاهِبًا وَرَاجِعًا» .رواه أحمد وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر: 6311

আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত , রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জামা‘আতের সাথে সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যায়, তার আসা এবং যাওয়ায় প্রতি পদক্ষেপে গুনাহ মিটে যায় এবং প্রতি পদক্ষেপে নেক ‘আমল লেখা হয়। (আহমাদ : ৬৩১১)

২। সালাত বান্দাকে শয়তান থেকে হিফাজত করে এবং তার প্ররোচনা থেকে নিরাপদ রাখে:

فعن أبي الدرداء ﷺ قالسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ، وَلَا بَدْوٍ، لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ، إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ،

فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ» رواه أبوداود وحسنه الألباني : 460

আবূ দারদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : যে গ্রামে বা মরুপ্রান্তরে তিনজন লোক অবস্থান করে অথচ তারা জামা'আত কায়েম করে সালাত আদায় করে না, শয়তান তাদের উপর চরে বসে। কাজেই জামা'আতে সালাত আদায় করা একান্ত অপরিহার্য। কারণ বাঘ দলছুট বকররীটিকেই উদরস্থ করে (আবূ দাউদ : ৪৬০)

৩। নিফাক থেকে পরিত্রাণ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি :—

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

أَثْقَلُ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ العِشَاءِ والفَجْرِ – متفق عليه1411 :

এশা ও ফজরের সালাত মুনাফিকদের নিকট সবচেয়ে বেশী ভারী বোঝা বলে মনে হয়। (বুখারী ও মুসলিম : ১৪১১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন:

مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ – رواه الترمذي وحسنه الألباني : 224

যে ব্যক্তি একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রথম তকবীরের সাথে জামা'আতে সালাতে আদায় করে, তার জন্য দু'টি মুক্তি রয়েছে : জাহান্নাম থেকে মুক্তি আর নিফাক থেকে মুক্তি। (তিরমিযী : ২২৪)

ইবনে মাসউদ বলেন :

وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ - رواه مسلم 1046 :

এক সময় আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, একমাত্র প্রকাশ্য মুনাফিক ব্যতীত আর কেউ জামা'আতে সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকেনি। (মুসলিম : ১০৪৬)

৪। কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ :—

عن بريدة ﷺ أن رسول الله ﷺ: قال«بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» - رواه أبو دواؤد وصحه الألباني :447

বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: অন্ধকার রাতে মসজিদে গমনকারীদের জন্য ক্বিয়ামত দিবসে পূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও। (আবূ দাউদ : ৪৪৭)

৫। জামা'আতে সালাত আদায়কারী আল্লাহর হিফাজতে :—

فعن أمامة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍوَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍوَغَنِيمَةٍ – رواه أبو داود وصححه الألباني : 2133

উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবলেছেন : তিন ব্যক্তি আল্লাহর জিম্মায়, তন্মধ্যে মসজিদে গমনকারী ব্যক্তি। সে আল্লার জিম্মায় থাকে ; এমনকি, তার মৃত্যু হলে তাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। অথবা তাকে ছাওয়াব বা গনীমত প্রদান করে (বাড়ীতে) ফিরিয়ে দিবেন। (আবূ দাউদ : ২১৩৩)

তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :—

مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَمَنْ أَخْفَرَ ذِمَّةَ اللَّهِ كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ لِوَجْهِهِ».رواه الدارمي : 3367

যে ব্যক্তি সকালের সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করে, সে আল্লাহর জিম্মায় থাকে। যে আল্লাহর জিম্মাকে অবমাননা করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (দারামী : ৩৩৬৭)

একটু ভেবে দেখুন ! যে ব্যক্তি সকল ফরয-সালাত জামা'আতের সাথে মসজিদে আদায় করে তার অবস্থা কত কল্যাণময় হতে পারে ?

৬। ঘরে সালাত আদায়ের চেয়ে মসজিদে সালাত আদায় অধিক ছাওয়াবের উপযোগী বানায় :—

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

وعن أبي هريرة - ﷺ - قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ - ﷺ: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَمَاعةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذلِكَ أَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلى المَسْجِدِ، لا يُخرِجُهُ إلاّ الصَّلاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلاّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّتْ عَنهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَهُ، مَا لَمْ يُحْدِث، تقولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ في صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ». متفقٌ عَلَيهِ

জামা'আতের সাথে সালাত আদায় ঘরে বা বাজারের সালাতের চেয়ে ২৫ গুণ বেশী ছাওয়াবের অধিকারী বানায়। আর এটা এভাবে যে, যখন সে অযু করে খুব সুন্দর করে । এবং (সালাতের জন্য) মসজিদের উদ্দেশো বের হয়। এ অবস্থায় সে যতবার পা ফেলে, প্রতিবারের পরিবর্তে একটি করে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি করে গুনাহ ক্ষমা করা হয়। তারপর যখন সে সালাত আদায় করতে থাকে, ফেরেস্তাগণ তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকেন। যতক্ষণ সে সালাতের জায়গায় বসে থাকে ফেরেশতারা তার জন্য এই বলে দু'আ করেন যো, হে আল্লাহ! এই ব্যক্তির উপর রহমত নাযিল কর। হে আল্লাহ ! এর উপর দয়া কর। আর যতক্ষণ সে সালাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, ততক্ষণ সে সালাতের অর্ন্তভুক্ত থাকে।' (বুখারী ও মুসলিম : ৬১১)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেন:

من غدا إلى المسجد أوراح أعد الله له في الجنة منزلا كلما غدا أوراح- متفق عليه

622 :

যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় মসজিদে গমন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন, যতবার সে সকালে বা সন্ধ্যায় গমন করে ততবারই। (বুখারী ও মুসলিম : ৬২২)

عن أبي أمامة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر ه الحاجالمحرم – رواه أبو داود وحسنه الألباني رقم الحديث : 471

আবূ উমামাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি নিজ গৃহ থেকে পবিত্র হয়ে ফরয সালাতের জন্য বের হয়, তার ছাওয়াব একজন হজ্জ পালনকারীর ছাওয়ারেবর সমান।(আবূ দাউদ : ৪৭১)

وعن جابر ﷺ قال: أراد بنو سلمة أن يتحول إلى قرب المسجد قال: والبقاع خالية فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما كان يسرنا أن كنا تحولنا – رواه مسلم : 1069

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : বনু সালামাহ গোত্র মসজিদের কাছে স্থানান্তরিত হতে মনস্থ করল। তিনি বলেন : জায়গা খালি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ খবর পৌছলে তিনি তাদেরকে বললেন : হে বনী সালামাহ ! তোমরা তোমাদের বর্তমান বাসস্থানগুলো ধরে রাখ। মসজিদে গমনাগমনের পদক্ষেপগুলো তোমাদের জন্যে লিখে রাখা হবে। তারা বললেন : স্থানান্তরিত হওয়া আমাদের কিই-বা আনন্দত দিতে পারে ! (মুসলিম: ১০৬৯)

৭। জামা'আতে সালাত আদায়কারী কিয়ামত দিবসে আরশের নীচে ছায়া পাবেন —: **عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله .وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد) رواه البخاري : 620**

সাহাবী আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ছায়া দান করবেন ঐ দিন, যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না ... তাদের মধ্যে একজন হল ঐ

ব্যক্তি যার হৃদয় মসজিদের সাথে লাগানো। অর্থাৎ সালাত ও জামা'আতের প্রতি অচ্ছেদ্যভাবে আগ্রহী। (বুখারী ও মুসলিম : ৬২০)

৮। আল্লাহ তা'আলা মুসল্লির আগমনে খুশী হন :—

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. رواه ابن خزيمة وأحمد وصححه الألباني 8131:

তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পরিপূর্ণভাবে অযূ করে, অতঃপর শুধুমাত্র সালাতের উদ্দেশ্যেই মসজিদে আসে, তবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি এমন খুশি হন যেরূপ খুশি হয় নিরুদ্দেশ ব্যক্তির আচম্বিতে ফেরে আসায় তার পরিবারের সদস্যরা । (ইবনু খুযাইমাহ : ৮১৩১)

৯। জামা'আতে সালাত একাগ্রতা অর্জন ও অন্তর বিগলিত হওয়ার উপকরণ :—

কোন মুসলিম যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন দুনিয়ার সকল ব্যস্ততা থেকে সে নিজেকে মুক্ত করে নেয়। আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়, অতঃপর সে মসজিদে আগত মুসল্লিদের আল্লাহর সামনে রুকু-সিজদারত অবস্থায় দেখে। যিকির এবং কুরআন তিলাওয়াত প্রত্যক্ষ করে। আল্লাহর কালাম স্বকর্ণে শোনার সুযোগ পায়। এ সব থেখে সে বুঝতে পারে এ ময়দান আল্লাহ ও তার জান্নাত লাভের উদ্দেশে প্রতিযোগিতার ময়দান। আর এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাকারীরাই আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সাথে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়।

১০। জামাতের সাথে সালাত আদায় মুসলমানদের মাঝমাঝে পারস্পরিক আন্তরিকতা ও মহব্বত সৃষ্টি করে :—

জামা'আতে সালাতে আদায়ের মাধ্যমে মুসলমানগণ দিন ও রাতে পাঁচবার পরস্পর মিলিত হয়। তাদের মাঝে সালাম বিনিময় হয়। একে অপরের খোজ-খবর নেয়।

হাসিমুখে একে অন্যের সাথে সাক্ষাত করে। এ সব বিষয় পারস্পরিক মহব্বত, ভালবাসা এবং একে অপরের কাছাকাছি আসার সুযোগ করে দেয়।

১১। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের নিকট মুসল্লীদের নিয়ে গর্ব করেন :—

عن عبد الله بن عمرو ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول :انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى – رواه أحمد و ابن ماجه 793 :

আব্দুল্লাহ বিন 'আমর রা. থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের প্রভু আসমানের দরজাসমূহের একটি দরজা খুলেছেন। সেখানে তোমাদের নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করে বলেন, দেখ আমার বান্দাদেরকে, তারা একটি ফরয আদায় করেছে এবং আরেকটি ফরযের জন্য অপেক্ষা করছে। (আহমাদ, ইবনে মাজাহ্* : ৭৯৩)

১২। এতে অজ্ঞ লোকের জন্য রয়েছে শিক্ষা এবং বিজ্ঞলোকের জন্য রয়েছে উপদেশ :—

যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে মসজিদে সালাত আদায় করে, সে সালাতের আহকাম, আরকান, সুন্নাত ইত্যাদি বিষয়গুলো আহলে ইলম থেকে শিখতে পারে। আহলে ইলমের সালাত দেখে উক্ত ব্যক্তি নিজের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করে নেয়। এমনিভাবে ওয়াজ-নসীহত শুনে ভাল কাজে উৎসাহিত হয়, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে। এতে সে অনেক উপকৃত হয়, যা ঘরে সালাত আদায় করে আদৌ সম্ভব নয়।

১৩। আল্লাহ তা'আলা জামা'আতে সালাত আদায়ে মুগ্ধ হন :

কতই না সৌভাগ্য ঐ ব্যক্তির, যার আমল দেখে সৃষ্টিকর্তা মুগ্ধ হন।

عن ابن عمر ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله ليعجب من الصلاة في الجمع – رواه أحمد وحسنه الألباني

ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি : নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা জামা'আতে সালাত আদায় করাতে মুগ্ধ হন। (আহমাদ)

১৪। জামা'আতে সালাত আদায়ের ছাওয়াব লিখা এবং আসমানে উঠানোর ব্যাপারে ফেরেশতাগণ বির্তক করেন :—

عن ابن عباس ﷺ قال قال: رسول الله ﷺ :أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة قال : أحسبه في المنام فقال يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت لا، قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدي أو قال: في نحري فعلمت ما في السموات وما في الأرض قال: محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم في الكفارات والكفارات : المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء على المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئة كيوم ولدته أمه – رواه الترمذي وصححه الألباني : 3157

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একরাতে আল্লাহ তা'আলা এক জ্যোর্তিময় অবস্থায় আমার নিকট এলেন । তিনি বলেন, সম্ভবতঃ তা নিদ্রায় হবে। এসে বললেন : হে মুহাম্মদ ! ঊর্ধ্বজগতে কি নিয়ে বিতর্ক হয় তুমি জান ? আমি বললাম না। তিনি বলেন : অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন, আমি তার শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। (অথবা বললেন আমার গলায়) তখন বুঝতে পারলাম আসমান যমীনের মাঝে কি হচ্ছে ? তিনি বললেন : হে মুহাম্মদ ! তুমি জান উপর আসমানে কি নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে ? আমি বললাম : হ্যাঁ, কাফফারা সম্পর্কে। কাফফারা হল সালাতের পর মসজিদে অবস্থান করা। পায়ে হেঁটে জামা'আতের জন্য গমন করা, কষ্টের সময়েও পুরোপুরি অযু করা। যে ব্যক্তি এটা করবে সে কল্যাণময় জীবন যাপন করবে এবং তার মৃত্যু মঙ্গলময় হবে । তার গুনাহগুলো মিটে এমন হবে যেন সে তার মায়ের উদর থেকে আজই জন্মগ্রহণ করল। (তিরমিযী : ৩১৫৭)

১৫। এটা মানুষকে ভাল কাজের প্রতিযোগিতায় অভ্যস্ত করে এবং নফলের প্রতি উৎসাহিত করে :—

عن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا ستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لا ستهموا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا (متفق عليه:580(

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি লোকেরা জানত আযান এবং প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর মধ্যে কি আছে, আর লটারীর মাধ্যম ছাড়া তা অর্জন করার অন্য কোন পথ না থাকত, তাহলে তারা অবশ্যই লটারী করত। যদি তারা জানত গরমের সময় ভর দুপুরে মসজিদে যাওয়ার কি ফযীলত, তাহলে অবশ্যই তার জন্যে প্রতিযোগিতা করত। যদি তারা এশা ও ফজরের সালাতের মধ্যে কি মর্যাদা আছে জানতে পারত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দু'টি সময়ের সালাতে শামিল হত। (বুখারী ও মুসলিম: ৫৮০)

অনুরূপভাবে সালাতের সাথে সালাত আদায় ব্যক্তিকে নফল সালাত আদায়েও অভ্যস্ত করে তুলে। যে ব্যক্তি সালাত কায়েমের পূর্বে মসজিদে আসে, সে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায়ের সুযোগ পায়, সুন্নাত পড়ার সুযোগ পায়, কুরআন তিলাওয়াত, দু'আ ইসতিগফার ইত্যাদির সুযোগ পায়। আর কিছু না করলেও অন্তত সালাতের অপেক্ষায় চুপ করে বসে থাকতে পারে। আর এ সময় ফেরেশতাগণ তার জন্য এই বলে দু'আ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি রহম কর। আবূ হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত একিট হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন —

أن رسول الله ﷺ قال: أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه .رواه مسلم:1063

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন সালাতের জন্য নিজের মসল্লায় অপেক্ষা করতে থাকে, তখন ফেরেশতাগণ তার জন্য দু'আ করতে থাকে যতক্ষণ তার অযু ভঙ্গ না হয়। ফেরেশতাগণ বলতে _

আল্লাহ ! তুমি একে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ ! তুমি এর উপর রহম কর। (মুসলিম : ১০৬৩)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫২৪৩

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়ার লাভ ও উপকারিতা

Amer ibn Abdullah

Member

১০-১৭-২০১৬

আমরা যারা মুসলিম, আমরা যারা উম্মাতে মুহাম্মাদি, আমরা যারা হাদিস অধ্যয়ন করি, পড়ি বা লিখি তারা, অবশ্যই নবীকুল শিরোমণি, মুত্তাকীদের ইমাম, মুজাহিদীনদের ইমাম, সারা জাহানের জন্য রহমত, পাপীদের জন্য আল্লাহর অনুমতিক্রমে শাফা'আতকারী এবং সত্য পথের প্রদর্শক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক নাম মুখ দিয়ে বার বার উচ্চারণ করে থাকি। সত্যবাদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের এক সাথী উবাই ইবনু কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কতই না সত্য কথা বলেছেন যে, হে কা'ব! যদি তুমি তোমার সম্পূর্ণ সময় আমার উপর দরূদ পড়ার জন্য ব্যয় করে দাও তাহলে তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের দুশ্চিন্তা ও দুঃখের জন্য তা যথেষ্ট হবে।(তিরমিযী: ২৪৫৭)

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে স্বীয় কালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿قُلۡ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدٗى وَشِفَآءٞۖ ٤٤﴾ [فصلت: ٤٤]

"হে মুহাম্মদ! আপনি বলে দিন। ঈমানদারদের জন্য এই কুরআন হিদায়েত ও শিফা"।(সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৪৪)

এই একই কথা নির্দ্বিধায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের ব্যাপারেও বলা যেতে পারে যে, ঈমানদারদের জন্য তা হল হিদায়েত ও শিফা। আল্লাহর নবীর উপর দরূদ পড়ার নির্দেশ তো আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন। সুতরাং, নবীর উপর দরূদ পড়ার অর্থই আল্লাহর আদেশের বাস্তবায়ন ও হুকুম পালন করা। আর নিঃসন্দেহে বলা যায় আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানা ও তার বাস্তবায়নই হল হিদায়েত। আল্লাহর কুরআন যেমন মানব জাতির জন্য শিফা, অনুরূপভাবে

আল্লাহর রাসূলের হাদিসও মানব জাতির জন্য শিফা। এ বিষয়ে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা রয়েছে। যেমন-

ইমাম রমাদী রাহিমাহুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে "তারীখে বাগদাদ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে: যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন তখন বলতেন: আমাকে হাদিস পড়ে শুনাও কেননা তাতে রয়েছে শিফা। পাক ভারত উপমহাদেশে শাহ ওয়ালী উল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ এর পরিবারের ধর্মীয় অবদানের কথা কার অজানা?। তাঁর পিতা শাহ আব্দুর রহীম রাহিমাহুল্লাহ বলতেন: দ্বীনি খেদমতের যা সৌভাগ্য আমি অর্জন করেছি তা সব একমাত্র দরূদ শরীফের বরকতেই করেছি।

আল্লামা সাখাবী রাহিমাহুল্লাহ 'আল কাউলুল বদী' গ্রন্থে অনেক মুহাদ্দিসের স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। যার দ্বারা প্রতিয়মান হয়, তাদের সবাইকে শুধুমাত্র এ কারণেই ক্ষমা করা হয়েছে যে তাঁরা হাদিস লেখার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের সাথে সাথে দরূদ পড়তেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়ার গুরুত্ব ও ফযীলত যে কত অপরিসীম তা আমরা চিন্তাই করতে পারি না। আমরা বিভিন্নভাবে আমাদের সময়কে অপচয় করে থাকি। যদি আমরা সময়কে অপচয় না করে আল্লাহর নবীর উপর দরূদ পড়তে থাকি, তা আমাদের একদিন কাজে লাগবে।

আল্লাহর নবীর উপর দরূদ পড়ার লাভ ও ফযিলত সম্পর্কে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত, যাতে যারা বেশি বেশি করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরূদ পড়ে তাদের অবস্থান ও মান মর্যদা তুলে ধরা হয়েছে। নিম্নে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়ার কয়েকটি লাভ ও উপকারিতা আলোচনা করছি।

এক. আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করা:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া মানে, আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করা। কারণ আল্লাহ নিজেই তার নবীর উপর দরূদ পড়ার নির্দেশ দেন এবং তিনি নিজেও তার উপর দরূদ পড়েন। যদিও আল্লাহর দরূদ পড়া আর আমাদের দরূদ পড়ার অর্থ এক নয়। আমাদের দরূদ পড়ার অর্থ হল, তার জন্য দো'আ করা। আর আল্লাহর দরূদ পড়ার অর্থ হল তার প্রশংসা করা।

অনুরূপভাবে রাসূলের উপর দরূদ পড়ার মাধ্যমে ফেরেশতাদের সাথেও একাত্মতা পোষণ ও তাদের অনুকরণ করা হয়। কারণ তারাও আল্লাহর নবীর উপর দরূদ পড়েন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦ ﴾ [الاحزاب : ٥٦]

"আল্লাহ তা'আলা নবীর উপর দরূদ পাঠ করেন। আর তাঁর মালাক তথা ফেরেশতাগণ নবীর জন্য আল্লাহর কাছে রহমতের দো'আ করেন। অতএব, হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরাও নবীর উপর সালাত ও সালাম প্রেরণ কর"।(সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৬)

দুই. আল্লাহ তা'আলা দরূদ পাঠকারীর উপর দরূদ পড়েন:

আল্লাহর নবীর উপর কেউ একবার দরূদ পড়লে আল্লাহ ও তার ফেরেশতারা তার দশবার দরূদ পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত লোকটি দরূদ পড়তে থাকে ফেরেশতারাও তার উপর দরূদ পড়তে থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا« (رواه مسلم.)

"যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশবার দরূদ পাঠ করে।(মুসলিম, হাদিস: ৩৮৪)

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ - ﷺ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبُشْرَى فِي وَجْهِهِ فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَى الْبُشْرَى فِي وَجْهِكَ؟ فَقَالَ: «إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: أَمَا يُرْضِيكَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا». (صحيح رواه النسائي وغيره

)."আব্দুল্লাহ ইবন আবি তালহা রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে উপস্থিত হলেন, আমরা তাঁর চেহারায় খুশির ভাব দেখতে পেলাম, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা

আপনার চেহারার মধ্যে আনন্দ দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন, আমার নিকট ফেরেশতা এসে বললেন, হে মুহাম্মদ তোমার রব বলেন, তুমি কি এতে খুশি নও যে, যদি কোনো ব্যক্তি তোমার উপর একবার দরূদ পড়ে আমি তার উপর দশবার দরূদ পড়ি এবং যদি কেউ একবার সালাম দেয়, আমি তাকে দশবার সালাম দেই?" [নাসাঈ, হাদীস:১২৮৩]

وعن أنس - ﷺ - قال: قال رسول الله - ﷺ» :- أَكْثِرُوا الصلاةَ عَليَّ يومَ الجمعَة؛ فإنه أتاني جِبريلُ آنفًا عن ربِّه - عزوجل - فقال: «مَا عَلَى الأرضِ مِن مُسلمٍ يُصَلِّي عليكَ مرَّةً واحدةً إلا صليتُ أنا وملائكَتي عليهِ عشرًا» (حسن رواه الطبر اني(

"আনাস রা. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জুমার দিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি করে সালাত পড়। কারণ, জিবরীল আ. আমার নিকট এখনি তার রবের নিকট থেকে এ বাণী নিয়ে এসেছে যে, "জমিনের উপর কোনো মুসলিম যদি আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আমি এবং আমার ফেরেশতারা তার উপর দশবার দরূদ পড়ি"।(তাবরানী, হাদিস:৫৬৭৪) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا صَلَّى عَلَيَّ؛ فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ». (حسن رواه ابن ماجه(

"কোনো মুসলিম আমার উপর দরূদ পড়া মাত্রই ফেরেস্তারা তার উপর সমপরিমাণ দরূদ পড়ে। সুতরাং, একজন মুসলিম যেন দরূদ পড়ে এবং বেশি করে দরূদ পড়ে। (ইবনু মাযা, হাদিস:৯০৭)

তিন- গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন:

যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একবার দরূদ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দশটি নেকি লিপিবদ্ধ করেন, দশটি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং দশটি দরজা বুলন্দ করেন।

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ - ﷺ - قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ الله - ﷺ - يَوْمًا طَيِّبَ النَّفْسِ يُرَى فِي وَجْهِهِ الْبِشْرُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَصْبَحْتَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ يُرَى فِي وَجْهِكَ الْبِشْرُ؟ قَالَ: «أَجَلْ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي - عز وجل - فَقَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا) .«صحيح رواه أحمد والنسائي(

“আবু তালহা আল আনসারী রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সকালে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হলে, আমরা তার চেহারার মধ্যে খুশি দেখতে পেলাম, আমরা বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার চেহারার মধ্যে আনন্দ দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন, আমার নিকট আমার রবের পক্ষ হতে একজন ফেরেশতা এসে বলল, যদি তোমার উম্মতের কোনো ব্যক্তি তোমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করেন, দশটি গুনাহ ক্ষমা করেন, দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার জন্য সমপরিমাণ রহমত প্রেরণ করেন।

(আহমদ, হাদিস:১৬৩৫২)

চার. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দরূদ পাঠকারীর আলোচনা:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়াতে রাসূলের সামনে তোমার নাম উল্লেখ করার সৌভাগ্য লাভ হয়। একজন মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় পাওনা আর কি হতে পারে যে তার নাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আলোচনা হয়। প্রমাণ:

فعن ابن مسعود - ﷺ - عن النبي - ﷺ - قال: «إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ» (صحيح رواه النسائي وابن حبان)

“আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহর কতিপয় ফেরেশতা রয়েছেন যারা বিশ্বে ঘুরে বেড়ায়। তারা আমার উম্মতের পক্ষ থেকে আমার কাছে সালাম পৌঁছিয়ে দেন। [নাসায়ী,ইবনে হিব্বান(সঃ)হীহ)]

وعن الحسن بن علي - ﷺ - أن رسول الله - ﷺ - قال: «حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي». (صحيح رواه الطبراني.)

"হাসান ইবন আলী রা. বলেন, তোমরা যেখানেই থাক, আমার উপর দরূদ পাঠ কর, কারণ, তোমাদের সালাত আমার নিকট পৌছানো হয়। [তাবরানী (হাদিস সহীহ)]

পাঁচ- রাসূলের উত্তর পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে দরূদ এবং সালামের উত্তর পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। প্রমাণ:

فعن أبي هريرة - ﷺ - عن رسول الله - ﷺ - قال: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ» (حسن رواه أحمد و أبو داود

"আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে কোনো মুসলিম আমার উপর সালাম দেয়, আল্লাহ তা'আলা আমার রূহকে শরীরে ফিরিয়ে দেয় যাতে আমি তার সালামের উত্তর দিতে পারি।[আহমদ ও আবু দাউদ:২০৪১, হাদিসটি হাসান]

ছয়- রাসূলের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি ও নৈকট্য লাভের কারণ হয়ে থাকে। প্রমাণ:

عن أبي أمامة - ﷺ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أكثِرُوا عليَّ مِن الصلاةِ في كلِّ يومِ جمعة؛ فإن صلاةَ أمَّتي تُعرَضُ عليَّ في كلِّ يومِ جمعة؛ فمَن كانَ أكثرَهم عليَّ صلاةً كانَ أقربَهُم منِّي منزِلةً» (حسن رواه البيهقي

"আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার প্রতি জুমায় আমার উপর দরূদ বেশি করে পড়, কারণ, আমার উম্মতের

দরূদ পাঠ প্রতি জুমায় আমার নিকট পেশ করা হয়, যে ব্যক্তি বেশি দরূদ পাঠকারী হয়ে থাকে, যে মর্যাদার দিক দিয়ে আমার বেশি নিকটে হয়ে থাকে।[বাইহাকী, হাদিস: ৫৯৯৫]

وعن ابن مسعود - ﷺ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً». (حسن رواه الترمذي.(

“ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের মধ্যে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন উত্তম হবে, যে আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পড়ে।[তিরমিযি]

হাদিসে উত্তম বলতে মানুষের সবচেয়ে কাছের লোক এবং যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ লাভে ধন্য তাদরে বুঝানো হয়েছে। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করেন তারাই রাসূলের অনুকরণ করেন এবং তাদের অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা থাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١ ﴾]ال عمران: ٣١[

“বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১]

সাত. গুনাহ মাপ হয়:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ গুনাহ মাপের কারণ হয় এবং দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য তা যথেষ্ট হয়। প্রমাণ:

عن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - ﷺ - قال: كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللهَ، اذْكُرُوا اللهَ، جَاءَتْ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ،

فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟فَقَالَ: «مَا شِئْتَ». قُلْتُ: الرُّبُعَ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: النِّصْفَ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: فَالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌلَكَ». قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا؟ قَالَ: «إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُلَكَ ذَنْبُكَ». (حسن صحيح رواه والترمذي(

"উবাই ইবন কা'ব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে উঠে যেতেন। অতঃপর তিনি বলতেন, হে মানুষেরা! তোমরা আল্লাহর যিকির কর, তোমরা আল্লাহর যিকির কর, রাজেফা তো প্রায় এসেই গেছে তারপরই রাদেফা আসবে। মৃত্যু তার আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে উপস্থিত, মৃত্যু তার আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে উপস্থিত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার উপর বেশি বেশি করে সালাত প্রেরণ করতে চাই। আমি আপনার উপর কতবার সালাত প্রেরণ করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যা পার, আমি বললাম, আমার সমূদয় দো'আর চার ভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন, তুমি যা পার, তবে যদি তুমি বাড়াও তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, তাহলে কি আমি আমার সমূদয় দো'আর অর্ধেক আপনার জন্য সালাত প্রেরণে নিয়োজিত করব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যা পার, তবে যদি তুমি বাড়াও তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, তাহলে কি আমি আমার সমূদয় দো'আর তিনভাগের একভাগ আপনার জন্য সালাত পাঠে ব্যয় করব? তিনি বললেন, তুমি যা পার, তবে যদি তুমি বাড়াও তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, আমি আমার সমূদয় দো'আই কি আপনার জন্য সালাত প্রেরণে কাটিয়ে দেব। তিনি বললেন, তাহলে তা তোমাকে দুশ্চিন্তা করবে এবং তোমার গুনাহসমূহ মুচে দেবে।[বর্ণনায় তিরমিযি, হাদিস: ২৪৫৭, তিনি বলেন হাদিসটি হাসান ও সহীহ।]

আট: শাফাআত লাভের কারণ হয়:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা তার শাফাআত লাভের কারণ হয়। প্রমাণ:

فعن عبد الله بن عمرو - ﷺ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «مَنْ صَلَّى عليَّ أو سألَ لِيَ الوسيلةَ حقَّتْ عليهِ شفَاعَتي يَومَ القِيَامَة» (رواه الجهضمي في فضل الصلاة على النبي - ﷺ - وصححه الألباني

"আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পড়ে অথবা আমার জন্য আল্লাহর নিকট ওসিলা চায়, কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত হবে।[আল্লামা জাহদামী হাদিসটি বর্ণনা করেন এবং আল্লামা আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।]

নয়. দো'আ কবুল হয়:

দো'আ করার পূর্বে দুরূদ পড়া হলে, তাতে তার দো'আ কবুল হয়। উমামাহ রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া না হলে, কোনো দো'আই কবুল করা হয় না।

হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা মুনাবী রহ. বলেন, (**كلُّ دعاءٌ محجوبٌ**) কথাটির অর্থ, দো'আ কবুল করা হয় না। অর্থাৎ, যে দো'আর সাথে দুরূদ পড়া হয় না, সে দো'আ আল্লাহর নিকট পৌছানো হয় না। কারণ, দুরূদ পাঠ করা দো'আ কবুল হওয়ার মাধ্যম।

وعن علي - ﷺ - قال: «كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -». (صحيح رواه الطبراني موقوفًا.)

"আলী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সব দো'আই বিরত রাখা হয়ে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া না হয়।[তাবরানী মওকুফ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন। হাদিসটি বিশুদ্ধ]

অন্য বর্ণনায় বর্ণিত,

وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ - ﷺ -» (صحيح رواه الترمذي

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব রহ. ওমর ইবন খাত্তাব রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেন, দো'আ আসমান ও জমিনের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, তোমাদের নবীর উপর দো'আ পড়া ছাড়া কোনো দো'আই আসমান পর্যন্ত আরোহন করে না।[বর্ণনায় তিরমিযি, হাদিস নং ৪৮৬, হাদিসটি সহীহ]

দশ. মজলিস বরকত পূর্ণ হয়:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া মুজলিস সুঘ্রাণ হওয়া ও কিয়ামতের দিন অনুতাপ মুক্ত হওয়ার কারণ হয়। যে মজলিসে আল্লাহর যিকির করা হয় না, তার প্রশংসা করা না হয় এবং তার নবীর উপর দরূদ পড়া করা না হয়, এ ধরনের মজলিস দূর্গন্ধময় হয়ে থাকে। আর যে মজলিসে দুরূদ পড়া হয় সে মজলিস দূর্গন্ধযুক্ত হওয়া থেকে মুক্ত হয়।

এগারো. কৃপণ বলে আখ্যায়িত করা হতে পরিত্রাণ লাভ:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারণ করার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা, তার নামের সাথে কৃপণ শব্দটি যোগ করা হতে মুক্তি লাভ করে এবং বান্দা অন্তরের কাঠিন্য হতে মুক্তি লাভ করে।

বারো. জান্নাতের পথ সুগম করে:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা দরূদ পাঠকারীকে জান্নাতের দিকে পথ দেখায় আর যে দরূদ পাঠ করে না তাকে জান্নাতের পথ হতে বিচ্যুত করে।

তেরো. উত্তম প্রশংসা অর্জন:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠকারীর সু-প্রশংসা আল্লাহ তা'আলা আসমানবাসী ও জমীন বাসীর মাঝে স্থায়ীভাবে ধরে রাখেন। কারণ, একজন মুসল্লি আল্লাহর নিকট এ বিষয়টিই কামনা

করেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেন, আল্লাহর রাসূলের মান, মর্যাদা ও সম্মান সর্বদা অবশিষ্ট রাখেন। সুতরাং তার বিনিময় ও তার অনুরূপই হবে। ফলে দরূদ পাঠ কারীর জন্য আল্লাহ তা'আলা একই বিনিময় (তার মান-মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখা) দান করবেন।

চৌদ্দ. বরকত লাভের কারণ:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা দরূদ পাঠকারীর আমল, হায়াত ও যাবতীয় কর্মে বরকতের কারণ হয়। কারণ, দরূদ পাঠকারী আল্লাহর রাসূল তার পরিবার পরিজন ও সাহাবীদের জন্য দো'আ করে থাকেন। আর এ দো'আ অবশ্যই কবুল হবে। আর যখন কোনো বান্দা অপরের জন্য দো'আ করে আল্লাহ তা'আলা তাকেও অনুরূপ বিনিময় দান করেন।

পনেরো. আল্লাহর রহমত লাভ:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া আল্লাহর রহমত লাভের কারণ হয়:

যেমন আল্লামা ইবনুল কাইয়েম রহ. বলেন, সালাতের এক অর্থ হল, রহমত। ফলে যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরূদ পাঠ করবে সে অবশ্যই আল্লাহর রহমত লাভে ধন্য হবে। অথবা সালাত পাঠের আবশ্যকীয় ও অনিবার্য ফল হল, আল্লাহর রহমত লাভ করা। সুতরাং একজন দরূদ পাঠকারী যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বেশি বেশি করে দরূদ পাঠ করবে তখন সে আল্লাহর পক্ষ হতে রহমতের ভাগি হবে।

ষোলো. রাসূলের মহব্বত স্থায়ী হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া ও দ্বিগুণ হওয়া:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি স্থায়ী মহব্বত, মহব্বত বৃদ্ধি ও দ্বিগুণ হওয়ার কারণ:

আর এটি হল ঈমানের দৃঢ় বন্ধন; এটি ছাড়া কখনোই একজন ঈমানদারের ঈমান পূর্ণতা লাভ করে না এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত ছাড়াও ঈমানের পূর্ণতা সম্ভব নয়। কোনো বান্দা যখন তার

মাহবুবের আলোচনা বেশি বেশি করে তখন তার অন্তরে তার উপস্থিতি স্থায়ী হয়। তার সৌন্দর্য ও গুণাগুণগুলো তার সামনে বার বার ভেসে উঠে। তার প্রতি তার ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়, তার প্রতি তার আগ্রহ ও শওক বাড়তে থাকে এবং তার অন্তরে সেই কেবল স্থান করে নেয়। আর যখন কোনো মানুষ তার মাহবুবের আলোচনা থেকে বিরত থাকে, তার সৌন্দর্যগুলোকে অবলোকন না করে তখন মাহবুবের প্রতি তার ভালোবাসা লোপ পায়। যখন কোনো মানুষ কাউকে ভালোবাসে তখন মাহবুবের দর্শন, তার সৌন্দর্যের আলোচনা ও তার গুণাগুণ ছাড়া কোনো কিছুই তার চক্ষুকে শীতল করতে পারে না, কোনো কিছুই তার অন্তরকে শান্ত করতে পারে না। সে তার মাহবুবের আলোচনা শুনতে ও তার দর্শন লাভ করতে সব সময় ব্যাকুল থাকে।

সতেরো. রাসূলের উপর দরূদ পড়া দ্বারা রাসূলের মহব্বহত লাভে বান্দা ধন্য হয়:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা, তার মহব্বতের কারণ:

দরূদ পাঠকারীর অন্তরে যেমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত বাড়ে অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত লাভেরও কারণ হয়ে থাকে।

আঠারো. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা বান্দার হিদায়েতের কারণ হয় এবং তার আত্মার জীবন লাভ হয়:

কারণ, যখন কোনো বান্দা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বেশি বেশি দরূদ পড়ে এবং তার আলোচনা করে, তখন তার অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত বৃদ্ধি পায়। তখন তার অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ নিষেধ পালনে তার অন্তরে কোনো সংকোচ থাকে না এবং তার আনীত শরীয়তের প্রতি তার মধ্যে কোনো প্রকার অনীহা ও অনাগ্রহ তার মধ্যে অবশিষ্ট থাকে না বরং তার অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়ত তার অন্তরে প্রগাঢ়ভাবে স্থান করে নেয় এবং অন্তরে তা বসে যায়। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ হতে হিদায়াত, কামিয়াবী ও বিভিন্ন ধরনের ইলম সংগ্রহ

করতে থাকে। যখন অন্তরের মধ্যে শক্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর মারেফত হাসিল হয় এবং দূরদর্শিতা অর্জন হতে থাকে, তখন তার উপর সালাত পাঠ আরও বৃদ্ধি পায় এবং তার রূহানী শক্তি প্রবল হয়।

ঊনিশ. রাসূলের হক আদায় করা:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ তার কিছুটা হলেও তার হক আদায় করা।

বিশ. আল্লাহর যিকিরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ আল্লাহর যিকির ও শুকরিয়া আদায়কে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তার বান্দার উপর তার অনুগ্রহসমূহ জানার সুযোগ করে দেয়। একজন দরূদ পাঠকারী যখন তার উপর দরূদ পড়ে তার দরূদের মধ্যে আল্লাহর যিকির থাকে, আল্লাহর রাসূলের আলোচনা থাকে, তার জন্য উত্তম বিনিময় চাওয়া হয়ে থাকে।

একুশ. বিপদ-মসিবত,কষ্ট-পেরেশানি দূর হয়ে যায়

দরূদ শরীফ সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিষন্নতা থেকে মুক্তি অর্জনের উপায়।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّى أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي ؟ قَالَ: مَا شِئتَ . قُلْتُ: الرُّبْعَ . قَالَ: مَاشِئْتَ ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. فَالثُّلُثَيْنِ. قَالَ: مَاشِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌلَكَ. قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا. قَالَ: إِذاً تُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ. (حسن ، رواه الترمذي ، صحيح سنن الترمذى للألبانى الجزء الثانى)

“উবাই ইবনু কা‘ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করি। আমি কত দরূদ পড়ব? তিনি বললেন, যত তোমার মন চায়। আমি বললাম, চতুর্থাংশ? তিনি বললেন: যত মন চায়। তবে আরও বাড়ালে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম- দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন: যত মন চায়। তবে আরও বাড়ালে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম- আমি আপনার জন্য পুরা সময়েই দরূদ পড়ব।

তিনি বললেন: তাহলে তোমার দুশ্চিন্তা দূর হবে এবং তোমার পাপ ক্ষমা হবে।[তিরমিযী, হাদিস: ১৯৯৯]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের কে তাঁরই হাবিব,মুহাম্মাদে আরাবি,রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর বেশী বেশী দুরুদও সালাম পাঠ করার তাওফিক দান করুন।

সতর্কতাঃ

অজ্ঞতার কারণে আমাদের সমাজে দরূদের নামে বিভিন্ন ধরনের বানানো দুরুদ,মিলাদ-কিয়াম,কু-সংস্কার,বিদ'আত,বানোয়াট ও উদ্ভট কথা-বার্তার প্রচলন রয়েছে। কিতাব, সুন্নাহ এবং সাহাবি(রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমায়িন) দের শিক্ষায় যার কোন উল্লেখ নাই। অনেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অতি ভক্তি প্রদর্শন করে এবং তাকে অধিক সম্মান দেখাতে গিয়ে তার সম্পর্কে এমন উদ্ভট কথা-বার্তা বলে থাকে, যা তার জন্য কখনোই প্রযোজ্য নয়। কিছু লোক তো তাঁকে আল্লাহর মর্যাদায় পৌঁছে দেন।তাই আমরা বাড়াবাড়ি এবং ছাড়াছাড়ি উভয় প্রকার গোমরাহি থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।

দুরুদ কিভাবে পড়তে হবে,কখন পড়তে হবে,দুরুদের শব্দগুলো কি হবে? এসবই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের(রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমায়িন) কে পরিপূর্ণভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন যা আমরা তাঁর হাদিসের মাধ্যমে জেনেছি।যদি আমরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো দুরুদগুলো পাঠ করি তবেই আমরা সওয়াব এবং ফজিলতের অংশীদার হবো ইংশাআল্লাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে দ্বীন এবং ইবাদত এর ক্ষেত্রে সকল প্রকার বিদ'আত থেকে হেফাজত করুন।

ভাই আপনারা উপরোক্ত পোস্টের একটা বিষয় লক্ষ করেছেন কি?? শুধুমাত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর নাম শুনার এবং লিখার সাথে সাথে দরুদ পড়ার কারনে যদি আল্লাহ তায়ালা অনেক মুহাদ্দিস কে ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন তাহলে, যে মানুষটি নিজের শরীরের সকল রক্ত দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান প্রতিরক্ষায় শাহীদ হয়ে গেল কিংবা যে

মানুষটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান প্রতিরক্ষায় ফাঁসি তে ঝুলবে তাঁদের জন্য আল্লাহ কি অফুরন্ত নেয়ামতের ব্যবস্থা করে রেখেছেন !!! একবার ও কি চিন্তা করে দেখেছি আমরা ?(যদি ও আমাদের চিন্তা-কল্পনা কখনো আল্লাহর সেই নেয়ামতের নিকট পৌঁছতে পারবে না)?

হ্যাঁ ভাই বুঝতেই পারতেছেন কাদের কথা স্মরণ করতেছি!! সে সকল সম্মানিত ভাই দের কথাই এই মুহূর্তে স্মরণ করতেছি যারা কাবার রবের শপথ সফল হয়েছে!!আমাদের প্রিয় রাসুল কে কটূক্তিকারী,বাংলাদেশের কুখ্যাত শাতিমে রাসুলদের শায়েস্তাকারী সে সকল সম্মানিত ভাই!!!

১। মুকুল রানা ভাই [গত রামাদানে মুরতাদ বাহিনীর(ডিবি) হাতে শাহীদ ইংশাআল্লাহ]
২। ফয়সাল আরেফিন দীপ ভাই [ফাঁসির দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত]

৩। মাহমুদুল হাসান আনিক [ফাঁসির দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত]

৪। জিকরুল্লাহ ভাই [মুরতাদ হাসিনা সরকারের কারাগারে বন্ধী, বিচার চলছে]

৫। আরিফুল ভাই [মুরতাদ হাসিনা সরকারের কারাগারে বন্ধী, বিচার চলছে]

এছাড়া ও বন্ধী আরও অনেক অজানা ভাই আছে,যাদের বিচার চলছে। অনেকের নামটাও আমরা জানি না। কিন্তু আল্লাহ তাঁদের সকল কেই চিনেন,হাউজে কাউসারের নিকট রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিকই তাঁদের সকলকে চিনে নিবেন!!ইংশাআল্লাহ।

হায় আফসোস!!

আফসোস এই দেশের কোটি কোটি মুসলমানদের দের জন্য*...

আফসোস এই দেশের লক্ষ লক্ষ আলেমদের জন্য যারা সর্বদা হাদিসের দরস দিচ্ছে,আফসোস এই দেশের লক্ষ লক্ষ তালিবুল ইলম দের জন্য যারা সর্বদা হাদিসের দারস নিচ্ছে..

কি জবাব দিবেন আপনারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাউজে কাউসারের নিকট ??

কিভাবে শাফায়েত কামনা করেন আপনারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট??

আপনারা কাদের বিরুদ্ধে মানব বন্ধন করতেছেন??

কাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন??

কাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছেন??

কাদের কে জঙ্গি বলতেছেন??

কাদেরকে সন্ত্রাসী বলতেছেন??

কাদের অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত করতেছেন??

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫১২৬

ফতওয়া_২=- আমার ছেলের নাম রাখবো বলে ঠিক করেছি, এ ব্যাপারে ইসলাম কি কোন নির্দেশনা দিয়েছে?

Ibnu Muhammad

Member

১১-০৫-২০১৬

২। প্রশ্নঃ আমার ছেলের নাম রাখবো বলে ঠিক করেছি, এ ব্যাপারে ইসলাম কি কোন নির্দেশনা দিয়েছে?

উত্তরঃ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

এব্যাপারে কোন দ্বিধা নেই যে, কারো নাম রাখা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেননা নাম একজন মানুষের পরিচয় বহন করে এবং এর মাধ্যমেই আমরা এক অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করি। নাম হলো একজন মানুষের এমন একটি অলংকার বা চিহ্ন যা দ্বারা একজন মানুষকে দুনিয়াতে ডাকা হয় এবং আখিরাতেও ডাকা হবে। বরং নামের মাধ্যমেই একজন ব্যাক্তি কোন দ্বীনের অনুসারী তা নির্নয় করা যায়। একজন ব্যক্তির নাম পোষাকের মতোই তার ব্যক্তিত্বকে আরো আকর্ষনীয় করে। তাই নাম রাখার ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তা করতে হবে তা যেনো পোষাকের মতোই না দীর্ঘ হয়, না খুব ছোট হয়!

প্রাথমিকভাবে শারীয়াহর কিছু সাধারন মুলনীতি আছে যা মানুষের নাম রাখার ক্ষেত্রে কিছু শ্রেনীবিভাগ করেছে, এর মাঝে কিছু জায়েজ আবার অনেকগুলো আছে যেগুলো নাজায়েজ এবং এই নাজায়েজ নামগুলো রাখার জন্য কোনভাবেই বেছে নেওয়া যাবে না। এধরনের নামের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলো-

- এমন নাম না রাখা, যে নামের অর্থ দ্বারা আল্লাহর দাসত্ব ব্যতিত অপর কোন কিছুর দাসত্ব বোঝায়; তা কোন রাসুল,নবী কিংবা ফেরেশতা যাই হোক কেনো। আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কোন সত্ত্বার দাসত্ব যেভাবে জায়েজ নেই, ঠিক তেমনি নাম রাখার ক্ষেত্রেও একই হুকুম। উদাহরন দিলে আরো সহজে বুঝতে পারবেন,

যেমনঃ কেউ যদি নাম হিসেবে আব্দুর রাসুল (রাসুলের দাস), আব্দুন নাবী (নবীর দাস), আব্দুল আমীর (রাজার দাস) সহ এধরনের যেই নামগুলো আল্লাহ ব্যতির অন্য কোন সত্ত্বার দাসত্বের পরিচয় বহন করে তা রাখা নাজায়েজ। এধরনের নাম কেউ রাখলে তা অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে।

একজন মহান সাহাবী ছিলেন, আব্দুর রহমান ইবনে 'আউফ (রা)। তিনি বলেন, 'আমার নাম ছিলো আব্দে 'আমর, অপর এক বর্ননায় আছে তিনি বলেন, 'আমার নাম ছিলো আব্দুল কাবাহ- কিন্তু আমি ইসলাম গ্রহন করার পর আল্লাহর রাসুল (সা) আমার নাম দিলেন, আব্দুর রহমান'। (আল-হাকীম, ৩/৩০৬। আয যাহাবী (রহ) এই বর্ননা সমর্থন দিয়েছেন)

- এমন নাম রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে যে সকল নাম কেবল আল্লাহ তা'য়লার সাথে খাস। যেমনঃ আল-খালিক (সৃষ্টিকর্তা), আর-রব (পালনকর্তা), আর-রহমান (পরম করুনাময়), ইত্যাদি। সে সকল নাম যেগুলো কেবল আল্লাহর জন্যই উপযুক্ত - মালিকুল মুলুক (রাজাদের রাজা), আল-কাহীর (প্রতাপশালী) ; এই ধরনের নাম রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে। কারন আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বলেন, "আপনি তাঁর (আল্লাহর) সমমানের কেউ আছে বলে কি জানেন?" (সুরা মারিয়ামঃ ৬৫)

- যেসকল নাম সরাসরি কুফফারদের পরিচয় বহন করে অথবা যেগুলো তারা ব্যতিত অপর কেউ ব্যবহার করে না;যেমনঃ আব্দুল মসীহ (মসীহ এর দাস), বুটরউস (নিঃশেষ আত্মা), জুরজুস (জর্জ)। অর্থ্যাৎ যেসকল নাম কুফফারদের ধর্মের সাথে সম্পর্কিত এমন নাম রাখা যাবে না।

-যেসকল নামে কোন মুর্তি কিংবা মিথ্যে ইলাহকে ডাকা হয়, তবে সে সকল নামে রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে। এসকল নাম সম্পুর্নরূপে হারাম, কেউ এ ধরনের নাম ধারন করে থাকলে, অবশ্যই তার নাম পরিবর্তন করতে হবে।

- যেসকল নামের কোন ভালো অর্থ নেই, যেসকল নাম বাজে অর্থ বহন করে অথবা, যেসকল নাম কারো মর্যাদাকে হীন করে এধরনের নাম রাখা শারীয়াহগত ভাবে মাকরূহ। এধরনের নাম রাখা আল্লাহর রাসুল (সা) এর সুন্নাহ বিরোধী, কেননা আল্লাহর রাসুল (সা) আমাদের সুন্দর নাম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

অনেকের নামে যুদ্ধ সম্পর্কিত অর্থ, অথবা কোন রোগের নাম প্রকাশমান থাকে; আর তাই বাজে অর্থ সংবলিত এধরনের নামের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে।

- কিছু নামে খুবই আকর্ষনীয় কিংবা উত্তেজক অর্থ নির্দেশ করে থাকে। আর বিশেষ করে যখন এ ধরনের নাম নারীদের ক্ষেত্রে রাখা হয় তখন তা অনুধাবন করা যায়, মানুষ খুব লোভনীয় চোখে তাদের দিকে তাকায়। এ ধরনের নাম রাখা মাকরূহ।

- নৈতিক অবস্থার অবক্ষয় হয়েছে এমন কারো নামে সন্তানের নাম রাখার ব্যাপারে মাকরূহ বলা হয়েছে; যেমনঃ গায়ক, নর্তকী এদের নামে। তবে হ্যাঁ, এসকল নৈতিকতা বিচ্যুত মানুষের নাম যদি শারীয়াহ বিরোধি নাম না হয় তবে রাখা যাবে; কিন্তু অবশ্যই সে নাম রাখতে হবে এর অর্থের সৌন্দর্যের কারনে। গায়কের ভক্ত হিসেবে সেই নাম রাখা যাবে না, তা যতো ভালো অর্থই প্রকাশ করুক।

- যেসকল নামের অর্থ পাপকে নির্দেশ করে বা পাপের কথা স্বরণ করিয়ে দেয়, এমন নাম রাখাও মাকরূহ। যেমনঃ সারিক (চোর), যালিম (অত্যাচারী)। অথবা কোন পাপাচারীর নাম ;যেমনঃ ফেরাউন, কারুন, এদের নামও রাখা মাকরূহ।

- পশু-পাখির নাম রাখাও মাকরূহ নির্দেশের মাঝে পরে যায়। কেননা তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট মানুষ থেকে পৃথক। যেমনঃ আল-হিমার(গাধা), আল-কালব(কুকুর), আল-কিরদ(বানর); এসব নাম রাখা যাবে না।

- এছাড়া এমন কোন নাম; যেসকল নামের অর্থ এতোই ভালো যে তা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে অতিরিক্ত প্রদর্শন করে, তবে এমন নাম রাখাও মাকরুহ। যেমনঃ আদ-দ্বীন, আল-ইসলাম অথবা নুরুদ্দীন (ধর্মের বাতি), শামসুদ্দীন(দ্বীনের সূরুজ), নুরুল ইসলাম (ইসলামের আলো), শামসুল ইসলাম (ইসলামের সুর্য) এবং আরো অনেক। এধরনের নাম রাখা মাকরূহ; কেননা তা একজন ব্যক্তির মর্যাদাকে অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেয়। আলেমগন ডাক নাম হিসেবে এধরনের নাম রাখাকে অপছন্দ করেছেন। ইমাম আন-নববী (রহ) নিজেই তাঁর ডাক নাম-মুহীউদ্দীন (দ্বীনের প্রান সঞ্চারকারী) ডাকাকে অপছন্দ করতেন। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ (রহ) তাঁর ডাক নাম ত্বকী উদ্দিন (ধর্মভীরু) ডাকাকে অপছন্দ করতেন, তিনি প্রায় সময় বলতেন, "কিন্তু আমার পরিবার এই নাম রেখেছে আর তাই এই নাম পরিচিত লাভ করেছে"।

- কেবল মাত্র আল্লাহর স্বতন্ত্র নামগুলোর সাথে দাসত্বের যে নামগুলো যুক্ত; যেমনঃ আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান, আব্দুর রহিম, নাম গুলো ব্যতিত নিম্নের উল্লেখিত উদাহরনগুলোর সাথে মিল রেখে অন্য কোন নাম রাখাও মাকরূহ। যেমনঃ হাসাবাল্লাহ, রহমতুল্লাহ (আল্লাহর রহমত) এইধরনের নাম রাখা মাকরূহ।

দেখুনঃ তুহফাত আল মাওদুদ -পৃ-১০৯ (ইবনুল কাইয়্যিম রহ.)

- কোন ফেরশতা কিংবা কোর'আন এর সুরা এর সাথে মিল রেখে কারো নাম রাখা মাকরূহ। যেমনঃ কারো নাম যদি রাখা হয় ত্ব-হা, কিংবা ইয়াসীন। কারন এধরনের নামগুলোকে বলা হয়, "হুরুফ আল মুকাত্ত্বা'আহ (যেগুলোর অর্থ কেবল আল্লাহই জানে)। এধরনের নাম রাখা মাকরূহ। তবে কারো ক্ষেত্রে যদি এমন হয়ে থাকে যে, পরিবার কর্তৃক ছোট থেকেই কোন এক ব্যাক্তি এধরনের নামে পরিচিত হয়ে বড় হয়েছেন, তবে তার ক্ষেত্রে নাম পরিবর্তন করাটা আলেমগন জরুরি মনে করেন নি। তাই নাম পরিবর্তন না করলেও চলবে।

যেসকল নাম রাখতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এর মাঝে চারটি ভাগ রয়েছেঃ

-সবচেয়ে ভালো ক্যাটাগরিতে যেদু'টো নাম রাখতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে সেদু'টো হলো-আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান। আল্লাহর রাসুল (সা) বলেন, "আল্লাহর সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান ;এইদু'টো নাম" (মুসলিম-১৩৯৮)
-দ্বিতীয় ক্যাটাগরীতে সেসকল নামগুলোকে রাখা হয়েছে যেগুলোর অর্থ আল্লাহর দাসত্বের প্রমান দেয়। যেমনঃ আব্দুল আযীয,আব্দুর রহিম, আব্দুল মালিক, আব্দুসসালাম, ইত্যাদি।

-তৃতীয় ক্যাটাগরির ভালো নামের মাঝে রয়েছে - আল্লাহর রাসুল এবং নবীগনের নাম। নিশ্চিতভাবে আল্লাহর রাসুল (সা) এর নাম এই ক্যাটাগরিতে সবচেয়ে ভালো নাম। এরপর মর্যাদা হিসেবে যেকোন নবী কিংবা রাসুলগনের নামে নাম রাখতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। (আল-আহক্বাফ ৪৬:৩৫) এক্ষেত্রে ইব্রাহীম, মুসা, 'ঈসা, নুহ (আলাইহিমুসসালাম) এবং এভাবে অন্য নবীগনের নামে নাম রাখা ভালো।
-চতুর্থ ক্যাটাগরিতে রয়েছে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের নামে নাম রাখা। এর মাঝে পুর্বেকার ভালো ব্যক্তি এবং আল্লাহর রাসুল (সা) এর প্রিয় সাহাবীদের নামে নাম

রাখা মুস্তাহাব। আলেমগন বলেন, এই নামে নাম রাখা হলে হয়তো নামের প্রভাবে একজন ব্যক্তি উঁচু মর্যাদায় আসীন হতে পারেন।

- এছাড়া বাকী যেসকল নামগুলোর অর্থ ভালো এবং সুন্দর এমন নাম ও রাখা যায়।

তবে বাচ্চাদের নাম রাখার পুর্বে কিছু বিষয় আমাদের মনে রাখা উচিত, যেমনঃ

- এমন নাম বেছে নেয়া যে নামে তাকে আমৃত্যু পরিচয় দিতে কোন বাধা থাকবে না। আর তাই যেনো এমন কোন লজ্জাজনক অবস্থায় আপনার বাচ্চা সম্মুক্ষিন হয়ে না পরে, সে বিষয় বিবেচনা করে সুন্দর নাম রাখা উচিত।

- বাচ্চার নাম রাখার পুর্বে কয়েকটি দিক বিবেচনায় রাখতে হবে। নামটি রাখার পুর্বে ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে। বাচ্চাটিকে এই নামে ডাকলে কেমন শোনাবে, যখন সে কৈশোরে পৌছুবে, যুবক বয়সে পৌছুবে, বৃদ্ধ হবে, সব বয়সেই যেনো নামটি তার ব্যক্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্য হয় তা বিবেচনায় রাখতে হবে। এমনকি যখন সে বাবা হবে তখন এই নামে কেমন স্যুট করবে তাও বিবেচনাধীন হওয়া উচিত। কারন ইসলামে বাবার নামেই সন্তান পরিচিত লাভ করে। যেহেতু ' আবু'(পিতা).... , এভাবে এই চেইন দীর্ঘ হবে তাই সেভাবেই নাম বেছে নেওয়া উচিত।

- বাচ্চার নাম রাখার অধিকার বাবার বেশী থাকবে। কেননা বাবার পরিচয়েই সন্তান বড় হবে। অবশ্য স্ত্রীর সাথে আলোচনা করে সন্তানের নাম বেছে নেওয়া মুস্তাহাব; এতে করে আপনার স্ত্রীও তার পছন্দের নাম উপস্থাপন করার সুযোগ পাবে, এবং এতে নিশ্চিতভাবে তিনি খুশি হবেন।

-সর্বাবস্থায় সন্তান পিতার পরিচয়ে বড় হবে। অর্থ্যাৎ বাবার নাম ব্যতিত অন্য কারো নামে সন্তানের নাম রাখা যাবে না; এমনকি যদি বাবা সন্তানের দেখাশুনা না করে তবেও অন্যের নামে নাম রাখা যাবে না। শারীয়াহ স্পষ্টভাবে এটি হারাম করেছে। তবে যদি কোন বাচ্চা অবৈধ শারীরিক সম্পর্কের মাধ্যমে (যা আল্লাহ হারাম করেছেন) পৃথিবীর মুখ দেখে তবে কেবল সেক্ষেত্রে মায়ের নামেই বাচ্চার নাম রাখতে হবে। এক্ষেত্রে বাবার নামে কোনভাবেই সন্তানের নাম রাখা যাবে না।

আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫৪১৪

লুতফুর রহমান ফরাজি ও "আহলে হক কর্তৃক সৃষ্ট সংশয়ের জবাব-১ কখন দারুল হারব দারুল ইসলামের পরিণত হয়?

umar mukhtar

Senior Member

০৯-২৭-২০১৬

#প্রশ্ন – দারুল ইসলাম ও দারুল হারব সম্পর্কে জানাবেন কি? কখন দারুল হারব দারুল ইসলামের পরিণত হয়? এ ব্যাপারে ওলামে্য কেরাম, সালাফ আস সালেহিন ও ওলামায়ে দেওবন্দের ফতোয়ার আলোকে জানাবেন। [প্রশ্ন করেছেন আপামর ফেসবুক জনতা]

(পূর্বে সম্ভবত পোস্ট হয়েছে, তবে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য পোস্ট করা হল).

উত্তর - প্রতিটি রাষ্ট্র হয়ত দারুল ইসলাম হবে নয়ত দারুল কুফর হবে। এ ব্যাপারে জুমহুর উম্মতের ঐকমত বিদ্যমান। কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলামও নয় আবার দারুল কুফরও নয় তা কখনই হতে পারে না।

আল্লামা কাসানী রহঃ বলেনঃ-

تَصِيرُ الدَّارُ دَارَ إِسْلَامٍ أَوْ دَارَ كُفْرٍ

“দার” হয়ত দারুল ইসলাম হবে নয়ত দারুল কুফর হবে ..... (বাদাইউস সানায়ে’, পরিচ্ছেদঃ কিতাবুস সিয়ার অধ্যায়ঃ মা’নাদ দারাইন দারিল ইসলাম ওয়া দারিল কুফর)

হ্যাঁ তবে দারুল কুফর আবার মৌলিক ২ ভাগে বিভক্তঃ-

(১) দারুল হারব। (যাদের সাথে মুসলিমদের কোন সন্ধি বা চুক্তি নেই)

(২) দারুল আহাদ। (যাদের সাথে মুসলিমদের সন্ধি বা চুক্তি আছে)

ইবনে আব্বাস রাদিঃ বলেনঃ-

كان المشركون على منزلتين من النبي ﷺ والمؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলিহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনদের কাছে মুশরিদের অবস্থান ছিল দুধরণের। কিছু মুশরিক ছিল যুদ্ধরত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন তারাও তাঁর বিরদ্ধে যুদ্ধ করতো। আর কিছু মুশরিক ছিল চুক্তিবদ্ধ। তিনিও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না তারাও তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত না। (সঃ)হীহ বুখারী, কিতাবুত তালাক, অধ্যায়ঃ নিকাহু মান আসলামা মিনাল মুশরিকাত ...,)

উপরোক্ত বর্ণীত হাদীস থেকে দারুল কুফর দুভাগে বিভক্ত হওয়া স্পষ্ট রূপে বুঝে আসে।

ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেনঃ-

والكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد

কুফফার হয়ত যুদ্ধরত হবে নয়ত চুক্তিবদ্ধ হবে। (আহকামু আহলিয যিম্মাহ, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-৪৭৫)

দারুল কুফর কখন দারুল ইসলাম হয়?

দারুল কুফর কখন দারুল ইসলাম হবে এ ব্যাপারে হানাফী ফুকাহাগনের মাঝে কোন দ্বিমত বিদ্যমান নেই। কিন্তু দারুল ইসলাম কখন দারুল কুফর হয় এ ব্যাপারে দ্বিমত বিদ্যমান।

আল্লামা কাসানী রহঃ বলেনঃ-

لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا فِي أَنَّ دَارَ الْكُفْرِ تَصِيرُ دَارَ إسْلَامٍ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهَا وَاخْتَلَفُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، إنَّهَا بِمَاذَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ؟

আমাদের ফুকাহাদের মাঝে এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, দারুল কুফর শুধুমাত্র ইসলামের আহকাম বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দারুল ইসলামে পরিণত হয়। তবে তাদের দ্বিমত হচ্ছে- দারুল ইসলাম কীভাবে দারুল কুফর হয় সে ক্ষেত্রে।

(বাদাইউস সানায়ে'। পরিচ্ছেদঃ কিতাবুস সিয়ার। অধ্যায়ঃ মা'নাদ দারাইন দারিল ইসলাম ওয়া দারিল কুফর)

ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়াতে একই মত উল্লেখ করা হয়েছেঃ-

اعْلَمْ أَنَّ دَارَ الْحَرْبِ تَصِيرُ دَارُ الْإِسْلَامِ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ إظْهَارُ حُكْمِ الْإِسْلَامِ فِيهَا

মনে রাখবে, দারুল হরব শুধুমাত্র একমাত্র শর্তে দারুল ইসলামে পরিণত হবে, আর তা হচ্ছে, সেখানে ইসলামের আইন বাস্তবায়িত থাকা। (ফাতাওয়ায়ে আলামগিরী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৩)

আলাউদ্দীন হাসকাফী রহঃ আদ-দুররুল মুখতারের মধ্যে বলেছেনঃ-

ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها

দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হয়, সেখানে ইসলামের আইন জারি করার মাধ্যমে। (দেখুনঃ- ফাতাওয়ায়ে শামী, কিতাবুল জিহাদ, বাবুল মুসতামিন)

এ ব্যাপারে পুরো উম্মতের ইজমা বিদ্যমান, দারুল কুফর শুধুমাত্র ইসলামী আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দারুল ইসলাম হবে। উপমহাদেশকে উলামায়ে হিন্দ দারুল হারব ফাতওয়া দিয়েছেন। যা সকলেই জানি। কেউ যদি সেই ফাতওয়াকে সঠিক বলে মেনে নেয়। তাহলে তাকে উম্মতের এই ইজমা আবশ্যকীয় ভাবে মানতে হবে- "ইসলামী আইন বাস্তবায়নের আগ পর্যন্ত উপমহাদেশের কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হিসাবে পরিগণিত হবে না। "

দারুল ইসলাম যেভাবে দারুল কুফর হয়

ইমাম আবূ হানীফা রহঃ এর মতঃ

দারুল ইসলাম কখন দারুল কুফর বলে গণ্য হবে, এ ব্যাপারে আমাদের ইমামদের মাঝে দ্বিমত আছে। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা রহঃ বলেনঃ-

إِنَّهَا لَا تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ إِلَّا بِثَلَاثِ شَرَائِطَ ، أَحَدُهَا : ظُهُورُ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِيهَا وَالثَّانِي : أَنْ تَكُونَ مُتَاخِمَةً لِدَارِ الْكُفْرِ وَالثَّالِثُ : أَنْ لَا يَبْقَى فِيهَا مُسْلِمٌ وَلَا ذِمِّيٌّ آمِنًا بِالْأَمَانِ الْأَوَّلِ

তিনটি শর্তে দারুল ইসলাম দারুল কুফরে পরিণত হবে।

এক, তাতে কুফরী বিধান নাফেয থাকা।

দুই, দারুল কুফরের পার্শ্ববর্তী হওয়া। (অর্থাৎ পাশে কোন দারুল ইসলাম না থাকা)

তিন, মুসলিম ও জিম্মিরা পূর্বে প্রদান কৃত নিরাপত্তার ন্যায় নিরাপদ না হওয়া। (ইসলামী শাসন থাকা অবস্থায় যেমন নিরাপদ ছিল তেমন নিরাপদ না হওয়া) (বাদাইউস সানায়ে', পরিচ্ছেদঃ কিতাবুস সিয়ার অধ্যায়ঃ মা'নাদ দারাইন দারিল ইসলাম ওয়া দারিল কুফর)

ইমাম আবু হানীফা রহঃ দারুল কুফরে পরিণীত হবার যে তিনটি শর্ত বর্ণনা করেছেন তার প্রতিটি শর্ত বর্তমান প্রায় সকল মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে পাওয়া যায়। কেননা এসমস্ত রাষ্ট্র কুফফারদের বিধান দ্বারা পরিচালিত। আর ইসলামী খিলাফাত বা শাসন থাকা অবস্থায় মুসলিমরা যে নিরাপত্তার মধ্যে ছিল তার শত ভাগের এক ভাগ নিরাপত্তার মধ্যেও মুসলিমগণ নেই। যা দিবালোকের উজ্জ্বল সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট। তবে দিনের বেলা কেউ চক্ষু বন্ধ করে থাকলে তা ভিন্ন কথা। আর আমাদের পার্শ্ববর্তী এমন কোন রাষ্ট্রও নেই যা ইসলামী আইন দ্বারা পরিচালিত। তাই কেউ যদি ইমাম আবু হানীফা রহঃ এর মতকেও গ্রহণ করে তথাপি এ ধরণের রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বা দারুল আমান বলার সুযোগ নেই।

আমাদের আহনাফ ফুকাহায়ের মত হচ্ছে, মুসলিম মুজাহিদীন যদি কোন দারুল কুফরে আক্রমণ চালায়। কাফেরদের পরাজয় ঘটে। মুজাহিদীন বিজয় লাভ করে। তথাপি ইসলামী আইন বাস্তবায়নের আগ পর্যন্ত তা দারুল ইসলামে পরিণত হবে না। দারুল ইসলাম হবার এক মাত্র শর্ত হচ্ছে, দ্বীন কায়েম করতে হবে। দ্বীন কায়েমের আগে তা দারুল ইসলাম হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইয়ূসুফ রহঃ এর মতে দারুল কুফরে গনিমত বণ্টন জায়েজ নেই। কিন্তু দেখা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার

বিজয়ের পর সেখানেই গণিমত বণ্টন করেছেন। এই মাসআলা আলোচনা করতে গিয়ে শামসুল আয়িম্মাহ ইমাম সারাখসী রহঃ বলেনঃ-

.وأما خيبر فإنه افتتح الأرض وجرى فيها حكمه فكانت القسمة فيها بمنزلة القسمة في المدينة وقسم الغنائم فيها قبل أن يخرج منها ففي هذا دليل أن الإمام إذا افتتح بلدة وصيرها دار إسلام بأجراء أحكام الإسلام فيها فإنه يجوز له أن يقسم الغنائم فيها وقد طال مقام رسول الله ﷺ بخيبر بعد الفتح وأجرى أحكام الإسلام فيها فكانت من دار الإسلام

আর খায়বারের ব্যাপারটি হচ্ছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার বিজয় করেছেন। সেখানে তাঁর বিধান (ইসলামী বিধান) জারি করেছেন। তাই সেখানে গণিমত বণ্টন মদিনায় বণ্টনের অনুরূপ। খায়বারে গণিমত বণ্টন থেকে প্রমাণিত হয়, যখন ইমাম কোন অঞ্চল বিজয় করবেন এবং ইসলামী শাসন জারি করার মাধ্যমে তাকে দারুল ইসলামে পরিণত করবেন, তখন ইমামের জন্য সেখানে গণিমত বণ্টন করা জায়েজ। খায়বার বিজয়ের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেথায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করেছেন। এবং সেখানে ইসলামী বিধান জারি করেছেন। ফলে তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে ছিল। (আল-মাবসূত, খণ্ড-১০, অধ্যায়ঃ কিতাবুস সিয়ার-গণিমতের বণ্টন)

ইয়ামানের নুজাইর অঞ্চল বিজয়ের ব্যাপারে শামসুল আয়িম্মাহ ইমাম সারাখসী রহঃ বলেনঃ-

إنهم فتحوا ولم تجر احكام الاسلام فيها بعد وبمجرد الفتح قبل اجراء احكام الاسلام لا تصير دار اسلام

সাহাবায়ে কেরাম নুজাইর বিজয় করেছেন। কিন্তু বিজয়ের পর পরেই (সাহায্যকারী অপর বাহিনী যুক্ত হবার আগে) সেখানে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করেননি। আর শুধুমাত্র বিজয়ের মাধ্যমে, ইসলামী শাসন জারি করার পূর্বে কোন রাষ্ট্র দারুল ইসলাম হয় না। (আল-মাবসূত, খণ্ড-১০, অধ্যায়ঃ কিতাবুস সিয়ার-গণিমতের বণ্টন)

নোটঃ উলামায়ে হিন্দ উপমাহাদেশকে দারুল হারব ঘোষণা করে ছিলেন। সুতরাং

দারুল হারব তখন পর্যন্ত দারুল ইসলাম হবেনা যতক্ষণ না সেখানে ইসলামী শাসন বাস্তবায়িত হয়। যদি মুসলিমগণ যুদ্ধ করে অথবা অন্য কোন ভাবে কোন অঞ্চল নিজেদের অধীনে নেয় তা দারুল ইসলামে পরিণত হবে না যতক্ষণ না সেখানে ইসলামী বিধান বাস্তবায়ন করা হয়। এটাই ফিকহে হানাফীর গ্রহণযোগ্য মত।

[উস্তাদ আহমাদ নাবিল হাফিযাহুল্লাহর লেখা থেকে সংগ্রহীত]

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৪৭৯৫